গল্পের মায়াপুরী



গল্পের মায়াপুরী

সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত

মোহন লাইব্রেরী

৩৫এ, সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জন্মাষ্টমী, ১৩৭৫
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৩৯৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু
মোহন লাইব্রেরী
৩৫-এ, সূর্য সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃ
শ্রীসুমুখ মিত্র
৬০, লেক প্লেস, কলিকাতা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসন্তোষকুমার পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, হায়াৎ খান লেন
কলিকাতা-৯

বাঁধিয়েছেন ঃ
বুক বাইণ্ডিং সেণ্টার
৪০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

মূল্য—দশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

য়্যাকসিডেন্ট



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সতীনাথবাবু বললেন, 'যেতে পারি কিন্তু তিন শর্তে। প্রথম শর্ত রাত আটটার মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন—'

'আটটার মধ্যে!' সভার উদ্যোক্তারা যেন কিছু বিমর্ষ হ'ল।

'উপায় নেই। ঐ দিনই রাত ন'টা বারো মিনিটে গৌতমের ট্রেন। ও স-আটটা নাগাদ বেরুবে বাড়ি থেকে।'

গৌতম—গৌতম মানে—'

'গৌতম মানে আমার ছেলে। ও একটা চাকরিতে ইন্টারভিয়ু পেয়েছে, ঐদিন ওর না বেরুলেই নয়।' সতীনাথ একটু হাসলেন :

'ওর বেরুবার আগে আমার পৌঁছুনো দরকার। একটু আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ করে দিতে হবে তো।'

'বেশ তো তাই হবে।' উদ্যোক্তার দল সোৎসাহে রাজী হয়ে গেল।

'বেশ তো, আপনি প্রধান অতিথি বা সভাপতি না হয়ে একেবারে উদ্বোধক হয়ে বসবেন। ওপনিং সং-এর পরেই আপনার বক্তৃতা।'

'আর বক্তৃতান্তেই প্রত্যাবর্তন বসা, বলা আর উঠে পড়া'।

'শুধু উঠে পড়া নয়, সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া!' উদ্যোক্তার দল আশ্বস্ত করল: 'তাই হবে। ছটায় মিটিং, মোটরে এক ঘণ্টার পথ, আমরা এখান থেকে পাঁচটায় বেরুব। ওপনিং সং আর কতক্ষণ, আপনি সাতটায় ভাষণ শেষ করেই স্টার্ট করবেন। গাড়ি মজুত থাকবে।'

'আর, শুনুন, দ্বিতীয় শর্ত, আপনাদের কারু প্রাইভেট গাড়িতে যাব না, ট্যাক্সিতে যাব।'

খানিকটা শহর-বাজার, আলোকিত কোলাহল আসে, ট্যাক্সিটা একটু সংযত হয়, আবার পেরিয়ে এসে ফাঁকায়, অন্ধকারে, হেড লাইট ফেলে সেই উদ্দাম মূর্তি ধরে।

'আরেকটু আস্তে গেলে হয় না?' ত্বরান্বিত সতীনাথই চাইলেন মন্থর হ'তে।

ড্রাইভার গ্রাহ্যও করল না।

আবার মিনতি করলেন সতীনাথ, 'এত জোরে যাবার কী দরকার!'

'আপনার দরকার না থাকতে পারে, আমার দরকার।' ড্রাইভার ধমকে উঠল: 'ঐ একটা ফুরন খাটলেই আমার পুষিয়ে যাবে? আমাদের সময়ের দাম নেই?

নিশ্চয় আছে, সতীনাথেরও আছে—সতীনাথ চোখ বুজলেন। কিন্তু চোখ বন্ধ করে আরও তাঁর ভয় করতে লাগল।

খুললেন চোখ, আর তক্ষুনি কী দেখলেন!

লোকটা রাস্তার বাঁ পাশে দিব্বি চুপচাপ ছিল, গাড়ি দেখে হতচকিতের মত ছুটল ও-পাশে, আর অমনি পড়ল গাড়ির সামনে। আর ঐ গাড়ির সামনে পড়ার মানে মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াল না। পিছনে লাইট নিবিয়ে দিয়ে ছুটল নক্ষত্রবেগে।

জায়গাটা শহর-বাজার থেকে দূরে, ফাঁকার মধ্যে। তাই পিছনে তেমন একটা জোর চিৎকার উঠল না। ধর-ধর গেল-গেল—ঐ পর্যন্তই। কেউ ট্যাক্সিটার পিছু নিল না। দিব্বি বেরিয়ে আসতে পারল।

'কী করলেন বলুন তো?' সতীনাথ ধিক্কারের সুরে বললেন।

'আমি কী করলাম! ড্রাইভার বললে নির্লিপ্তের মতঃ 'যা করবার ওর নিয়তি করল। ওই বা ওখানে থাকে কেন, আর কেনই বা ও রাস্তাটা তখন ক্রস করে?'

'কিন্তু এখনো হয়তো ওর প্রাণ আছে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো এখনো বেঁচে যায়—কার না জানি ছেলে কার না জানি স্বামী—' সতীনাথ মিনতি করতে লাগলেনঃ 'চলুন, ফিরে চলুন ওটা তো আমাদের কর্তব্য—ওকে হাসপাতালে দিয়ে আসি—'

ড্রাইভার পাগলের মত হেসে উঠল। তার মেট বললে, 'ওখানে এখন গাড়ি নিয়ে গেলে গাড়ি তো পুড়িয়ে ফেলবেই, আমাদেরকেও লাশ করে ছাড়বে, আপনাকেও রেহাই দেবে না।'

কথাটা হয়তো সত্যি। কিন্তু কী জানি সতীনাথ যদি বুঝিয়ে বলেন, জনতা মারমুখো নাও হ'তে পারে। বিশেষত যখন দেখবে সেই অপরাধী ট্যাক্সিই দয়াপরবশ হয়ে ফিরে এসেছে আহতকে সাহায্য করতে।

'যদি মরে গিয়ে থাকে!' মুখ খিঁচিয়ে উঠল ড্রাইভারঃ 'তখন তো আমরা সকলে পুলিশের হাতে। তাই চান?'

সত্যিই তো, তাও তো কাম্য নয়।

'একবার বেরিয়ে আসার পর ফের ফেরা যায় না।' মেট ঝাঁজিয়ে উঠলঃ 'গোড়ায় পালিয়ে গিয়েছিলাম কেন তারই জন্যে আরেক প্রস্থ মার চলবে।'

'কী হবে ধরা পড়লে?' ড্রাইভার বললে, 'জেল নয় জরিমানা

হবে। লাইসেন্স যাবে। কিন্তু মার তো খেতে হবে না। গাড়িটাও তো আস্ত থাকবে।'

'কী করে ধরবে?' মেট সতীনাথের দিকে তাকাল রুষ্ট চোখে: 'কে খবর দিতে যাবে? কেউ দেখে নি, কেউ নম্বর নিতে পারে নি। প্রমাণ কী যে আমাদের ট্যাক্সি মেরেছে!'

'না, না, সে কথা হচ্ছে না।' সতীনাথ কণ্ঠস্বর মোলায়েম করলেন: 'আমি বলছিলাম একটা নিরীহ বিপন্ন লোকের সাহায্যের কথা—'

'যান, আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নেমে যান, ড্রাইভার গাড়ি থামাতে চাইল: 'সাহায্য করুন গে।'

সতীনাথ চোখে অন্ধকার দেখলেন। এই বেঘোরে নামিয়ে দিলে যাবেন কোথায়?

সতীনাথকে নীরব-নিশ্চল দেখে ড্রাইভার আবার গাড়ি ছোটাল। বললে, 'আমার সাহায্যের কোনো দরকার নেই। কিন্তু এই র‍্যাশ ড্রাইভিং কার জন্যে? এই য়্যাকসিডেণ্টের মূলে তো আপনি। আপনাকেই তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যেই এই দুর্দশা। আপনি এখন ভালোমানুষ সেজে সাহায্য করতে চলেছেন!'

সতীনাথ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সন্দেহ কী, তিনিই তো প্ররোচনা-দাতা, আসল অপরাধী। তাঁর যে শাস্তি আছে তা হোক, কিন্তু অকারণে মার খেয়ে তাঁর চোখের সামনে একটা নির্দোষ লোক পড়ে থাকবে, তিনি তার কোনো উপশমে লাগবেন না, এ যন্ত্রণাও দুর্বিষহ।

বাড়িতে পৌঁছে দিল ট্যাক্সি। কিন্তু পৌঁছে দেখেন, হুলুস্থুল কাণ্ড। সাড়ে আটটা বাজে কিন্তু গৌতম এখনো বেরোতে পারে নি। আধ ঘণ্টার উপর একটা ট্যাক্সি যোগাড় হচ্ছে না। বাড়ির চাকর-ঠাকুর দু'জন দু'দিকে বেরিয়েছে, ট্যাক্সি নেই।

বাবার ট্যাক্সিটা দেখে গৌতম একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ড্রাইভারকে বললে, 'আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে হাওড়া স্টেশন।'

ড্রাইভার দৃপ্তভঙ্গিতে বললে, 'কুড়ি মিনিট।'

ছেলেকে সতীনাথ আশীর্বাদ করে দিলেন বটে, কিন্তু তার দু'হাত থরথর করে কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল এই হাওড়া যাবার পথেই আরেকটা য়্যাকসিডেণ্ট। কে জানে নিয়তি হয়তো অমনি করেই ছকে ঘুঁটি সাজাচ্ছে।

আকুলস্বরে ছেলেকে বললেন, 'স্টেশনে পৌঁছেই যদি সময় পাস একটা টেলিফোন করে দিস যে ঠিকমত পৌঁছেচিস।'

ড্রাইভার ভাড়ার জন্যে হাত বাড়াল। হ্যাঁ, ফুরনের প্রাপ্য বাকিটা দিয়ে দিতে হবে বৈকি। রোগীকে মেরে ফেললেও ডাক্তারকে তার ফি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কিছু বলবার দরকার নেই। ড্রাইভারের প্রাপ্য টাকাটা দিয়ে দিলেন সতীনাথ। শুধু আরেকবার ট্যাক্সির নম্বরটা দেখে রাখলেন।

এবার গৌতমই প্ররোচনা যোগাল: 'শীগ্‌গির চলুন, খুব তাড়াতাড়ি। কুড়ি মিনিট, পারেন তো আরো দু'চার মিনিট কম।'

তীরবেগে ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল।

বাড়ির ভিতরে পা দিতেই সতীনাথের স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল: 'ছানার জিলিপি!'

এই যা। এ আরেক য়্যাকসিডেণ্ট। ট্যাক্সির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়িতে নামানো হয় নি। ড্রাইভার আর তার মেট বসে খাবে মনের সুখে। খুনও করল মিষ্টিও খেল।

যাক গে জিলিপি। ছেলেটা ঐ ড্রাইভারের হাত থেকে রক্ষা পায় তা হ'লেই হ'ল। দুর্গা-দুর্গা। অনেক দেরিতে হ'লেও আরেকবার বললেন সতীনাথ। ছেলেটা কোনো দোষ করে নি।

ঐ উদ্‌ভ্রান্ত পথচারীটাই বা কী দোষ করেছিল?

না, গৌতম খুব ভালো ছেলে। সে জানে তার বাবা কেমন উদ্বেগী। স্টেশন থেকে ঠিক টেলিফোন করেছে। 'বাবা, ঠিকমত পৌঁচেছি স্টেশনে। ট্রেন এখনো ইন্ হয় নি। কিচ্ছু ভেবো না। ঠিকঠাক ঘুমিয়ো রাত্তিরে।'

কিন্তু, এ কী, কতক্ষণ পরে সেই ট্যাক্সি এসে হাজির! 'আপনার মিষ্টির হাঁড়িটা দিয়ে যেতে এসেছি, ভুলে তখন নামানো হয় নি। এক মুখ হাসল ড্রাইভার। পরে বাঁকা করে হেসে বললে, গাড়ির নম্বরটা আশা করি ভুলে যাবেন। য়্যাকসিডেণ্টের ঠাকুরকে তো আর মিছিমিছি পয়সা দিই নি।'

'য়্যাকসিডেণ্টের ঠাকুর? সে কী!' সতীনাথ জ্বলে উঠলেন ঃ 'সে তো য়্যাকসিডেণ্ট করিয়ে ছাড়ল।'

'তা করাক। আমাকে তো বাঁচিয়ে দিল। ভক্তকে বাঁচানো নিয়ে হচ্ছে কথা।' ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার।

সতীনাথ তাকালেন নম্বরের দিকে। কে জানে নম্বরপ্লেটটা ইতিমধ্যে বদলে ফেলেছে কিনা।

শরীর খারাপের ওজুহাতে সতীনাথ মিষ্টি স্পর্শ করলেন না, ছেলের অনুরোধ সত্ত্বেও ঘুমুতে পারলেন না একফোঁটা। তাঁরই জন্যে একটা লোক আহত হ'ল অথচ তার জন্যে কিছুই তিনি করতে পারলেন না এ দুঃখে তিনি পুড়ে যেতে লাগলেন।

পরদিন খবরের কাগজ দেখে সতীনাথের চক্ষুস্থির। কাল যখন ও যেখানে তাঁদের ট্যাক্সি য়্যাকসিডেণ্ট করেছে তারই বিস্তৃত খবর বেরিয়েছে।

'একটা প্রাইভেট গাড়ি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একটি লোককে চাপা দিয়েছে। সেই গাড়িতে করেই লোকটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অবস্থা সঙিন। পুলিশ গাড়ির মালিক-চালককে গ্রেপ্তার করেছে। আহত লোকটিকে এখনো সনাক্ত করা যায় নি। যতদূর মনে হয় লোকটি বাঙালী।'

কী ব্যাপার, অনেক খুঁজে পেতে দিন কয়েক পরে সতীনাথ সেই প্রাইভেট গাড়ির মালিক-চালককে বার করল। কী হয়েছিল বলুন তো ?

'আরে মশাই, পরোপকার করতে গিয়ে এই বিপদ।' ভদ্রলোক বললেন, 'রাস্তায় দেখলাম চাপা-পড়া একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বাঁচানো যায় কিনা তাই ভেবে লোকজন ডেকে ধরাধরি করে আমার গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। পুলিশ এমন চতুর, যেহেতু আমার গাড়িতে হাসপাতালে বয়ে নিয়ে এসেছি, আমি চাপা দিয়েছি। আসল লোকের খোঁজ নেই, আমাকেই য়্যারেস্ট করলে। স্থানীয় লোকেরা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি ঘটনার পরে এসেছি তা পুলিশ শুনতে চায় না।'

'আহত লোকটির কী হ'ল ?'

হাসপাতালে ভর্তি হবার চারদিন পর মারা গেছেন।'

'আর আপনার কী হ'ল ?'

'পুলিশের হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছি বটে কিন্তু হাসপাতালের হাত থেকে রেহাই নেই।'

'কেন, সেখানে কী ?'

'দেখুন না, হাসপাতাল আমার নামে এই পঁয়তাল্লিশ টাকার বিল পাঠিয়েছে।' ভদ্রলোক বিল দেখালেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'যেহেতু আমি ঐ আহত লোকটিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছি, হাসপাতাল আমার নাম-ঠিকানা রেখেছে ও চারদিন চিকিৎসা করতে যা খরচ হয়েছে তারই লম্বা বিল পাঠিয়েছে আমাকে।'

'ও, হ্যাঁ আপনাকে আমি সেই টাকাটা দিতে এসেছি।' সতীনাথ মনিব্যাগ খুলে টাকাটা বের করলেন। রাখলেন টেবিলের উপর।

'সে কী', ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ঃ 'ঐ লোকটি আপনার কেউ হয় নাকি ?'

সতীনাথের ছ'চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, ও আমার আত্মীয়। আমার ভাই।'



ফাঁসিগাছ

প্রমথনাথ বিশী

আমাদের গ্রাম থেকে রেল ষ্টেশনে পৌঁছবার পথের মাঝামাঝি জায়গায় একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল। গাছটি একটি বনস্পতি, যেমন বিশাল, তেমনি প্রাচীন; আর সেটা যে কি গাছ তার পরিচয় কেউ জানতো না। এদেশের উদ্ভিদের সঙ্গে তার গোত্রের মিল ছিল না। চারিদিকের বৃক্ষরাজির মধ্যে সেই বলিষ্ঠ, সমুন্নত, অজ্ঞাতকুলশীল বৃক্ষটি পাণ্ডব-সৈন্যসমাবেশের মধ্যে যেন ঘটোৎকচ। স্বভাবতঃই বৃক্ষটি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো, কিন্তু তার আরও কারণ ছিল, সেটি ছিল একটি ফাঁসিগাছ। লোকে বলতো—নবাবী আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ফাঁসি দেবার জন্য গাছটি ব্যবহৃত হ'ত। কাছেই একটি গ্রামে থাকতো নবাবের ফৌজদার; প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা ছিল তার; কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে জল্লাদে লোকটাকে ঝুলিয়ে দিতো গাছটির একটি ডালে। মানুষ ঝুলিয়ে দেবার মতো ডালগুলোই বটে।

গাছটির গুঁড়ি থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাতের মধ্যে কোন ডালপালা নেই, একেবারে পরিষ্কার গা, মসৃণ, তার উপরে ডাল বেরিয়েছে; এক-একটা ডাল কি লম্বা, একেবারে গ্রামান্তর গিয়ে যেন পৌঁছায়, এমনি থাকে থাকে সুবিন্যস্ত ডাল উঠে গিয়েছে; যত উঁচুতে উঠেছে ততই ডালের দৈর্ঘ্য কম; সবসুদ্ধ মিলে গাছটির উপরের দিকে ছুঁচালো—মন্দিরের আকৃতি। গাঁয়ে গোপাল বলে একজন বৃদ্ধ মুসলমান কৃষাণ ছিল, সে বলতো তার ঠাকুর্দা নাকি ঐ গাছে ফাঁসি দিতে দেখেছে, সেটাই ছিল নাকি ঐ গাছে শেষ ফাঁসি লটকানো। গোপালের বয়স তখন ছিল বিরানব্বই; গোপালের কথা সত্যি হ'লে তার ঠাকুর্দার সময় নবাবী আমলের শেষ পড়ে বটে; আর তার মুখে এ গল্পটাও শুনেছি আমার বাল্যকালে; কাজেই গোপালের নিরানব্বই-এর সঙ্গে আমার বয়েসের মোটা একটা অঙ্ক জুড়ে নেওয়া উচিত।

যাই হোক শেষ ফাঁসির বর্ণনা সত্য হোক আর নাই হোক, গাছটা যে ফাঁসিগাছ ছিল তা নিঃসন্দেহ। জেলা গেজেটিয়ার পুস্তকে ফৌজদার-অধ্যুষিত ঐ গ্রামটির উল্লেখ আছে, আরও উল্লেখ আছে যে কাছাকাছির গাছগুলোতে ফাঁসি দেওয়া হ'ত। তা যদি হয় এমন যোগ্য গাছটির ব্যবহার না হবার কথা নয়।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস যাক। যা বলতে বসেছি তা হচ্ছে ঐ ইতিহাসের স্মৃতি। সেদিনের বিষাক্ত স্মৃতি আজও গাছটিকে ভয়াবহ করে রেখেছিল। কেউ পারতপক্ষে রাতের বেলায় গাছটির কাছে যেত না, একা তো নয়ই। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা যে, না গিয়েও উপায় ছিল না, রেল ষ্টেশনে যাবার সড়কের ঠিক পাশেই তার অবস্থান। কত নিঃসঙ্গ পথিক যে রাতের বেলায় ওখানে এসে দব্‌কে মূর্ছা গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাদের প্রশ্ন করলে বলতো—কি দেখলাম? তা কি এখন মনে আছে? তবে মনে হ'ল গাছের ডালে সারি সারি যেন মৃতদেহ ঝুলছে!

আবার কেউ বা বলতো মুমূর্ষুর অন্তিম আর্তনাদ স্পষ্ট শুনেছে। একজন বলেছিল, সে লোকটা বিদেশী—গাছের ইতিহাস জানতো না, ঐ গাছতলায় পৌঁছুবামাত্র হঠাৎ একটা মৃতদেহ ধপ্ করে তার পায়ের কাছে পড়ল ; সে চমকে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে যে গাছের ডালে লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। প্রশ্নের খোঁচা খেয়ে সে বলল যে, সেটা ছিল জ্যোৎস্না রাত্রি, তার ভুল দেখবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

তবে এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এসব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সত্য হ'তে পারে না। কেননা, ফাঁসি হ'ত বহুকাল আগে। তার সেদিনের স্মৃতি যদি কোন অলৌকিক সুড়ঙ্গ-পথে আজ মূর্তি ধরে দেখা দেয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা ; যুক্তি দিয়ে প্রমাণ-অপ্রমাণ করার পথ বন্ধ ।

কিন্তু যুক্তি এক আর বিশ্বাস আর। লোকের মনের ব্যাপক বিশ্বাসই এখন তথ্যের স্থান গ্রহণ করেছিল, আর তা-ই ছিল যথেষ্ট। ফলে, ঐ গাছটা যাতায়াতের পথের পাশে ভীতিমিশ্রিত একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়ের চিহ্নের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

তারপর বয়েস বাড়লে কলকাতায় গেলাম কলেজে পড়তে। আমাদের মেসে একজন বয়স্ক ব্যক্তি থাকতেন, তাঁর থিওজফি চর্চার বাতিক ছিল। তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তাঁকে ফাঁসি-গাছটির বিবরণ শুনিয়ে ছিলাম। তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বললেন, এমন হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, যেখানে কোন মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে থাকে, সেখানে পরবর্তীকালে সেই মৃত্যুদৃশ্যের ঠিক পুনরভিনয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কেন এমন হয়, তিনি বললেন, তিনি জানেন না। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। মৃত্যুর সময় মানুষগুলো যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করেছিল, সেই নিদারুণ তাড়নাতেই ওখানে ঐ রকম অলৌকিক ছায়াছবি উদ্ভূত হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন।

বলা বাহুল্য এ ব্যাখ্যা আমার মনঃপূত হ'ল না, কিন্তু ও নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করি নি।

তারপর কর্মজীবনে প্রবেশ করলাম এবং চাকরি উপলক্ষে নিজের গ্রাম থেকে একপ্রকার নির্বাসিত হলাম। বহুকাল, জীবনের তুটি দশক কাটলো দেশ এবং দেশান্তরে। এই সময়ের মধ্যে স্বগ্রামে যাওয়ার সুবিধে হয়ে ওঠে নি। কালক্রমে গ্রামের ছবি মনে ঝাপসা হয়ে এল। রেল ষ্টেশনে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে যে-সব দৃশ্য, বাড়িঘর, গাছপালা, এমন কি মানুষের যে মুখ-গুলো যাতায়াতের পথের পাশে দেখতে পেতাম ক্রমে ক্রমে ভুলে গেলাম, সেই সঙ্গে ফাঁসিগাছটার স্মৃতিও মন থেকে মুছে গেল।

প্রায় কুড়ি বছর পরে গ্রামে চলেছি। সন্ধ্যাবেলায় নামলাম ষ্টেশনে, একখানা টমটম গাড়ি ভাড়া করলাম, বারো মাইল পথ পৌঁছতে এক প্রহর রাত হবে। পথে চলতে চলতে পুরাতন ছবিগুলো জন্মান্তরের স্মৃতির মতো মনে পড়তে লাগলো, মনে হ'ল যেন ধীরে ধীরে নিজের অতীতকালের মধ্যে প্রবেশ করেছি। রাত তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মাঝামাঝি পথে এসে পড়েছি এমন সময়ে সেই ফাঁসিগাছটার কথা মনে পড়লো। ভয় হ'ল না, সঙ্গে তো গাড়ির গাড়োয়ান আছে, কৌতূহল হ'ল খুব। অভিনব কিছু দেখা যায় কিনা ভেবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ করে নিয়ে স্থির হয়ে বসলাম। এবারে বোধ করি ফাঁসি-গাছের কাছে এসে পড়েছি, রাস্তার বাঁ দিকে গাছটা। ঐ তো গাছটা। কি বিরাট! অন্ধকারের আলখাল্লা প'রে যেন এক অতিকায় পুরুষ। লোকে যে ভয় পাবে তা আশ্চর্য কি, আমারই সর্বাঙ্গ শিরশির করে উঠলো। নির্বিপাকে গাছগুলা অতিক্রম করে গেলাম। কিছুদূরে এসে গাড়োয়ান বলল, বাবু, এখান দিয়ে আগে রাতের বেলায় যাওয়া বড় কঠিন ছিল।

—কেন?

—ফাঁসিগাছটার ভয়ে।

কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠলাম, শুধোলাম ... এখন বুঝি সাহস বেড়েছে?

—সাহস বাড়তে যাবে কেন? ভয়ের ব্যাপার তো আর নেই।

—গাছটার ভূত ছেড়ে গিয়েছে বুঝি?

—গাছটাই যে গিয়েছে!

—কোথায় যাবে?

—আপনি বুঝি এ পথে অনেকদিন আসেন নি। তাই জানেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো!

সে আরম্ভ করলো—বছর পাঁচেক আগে একবার বৈশাখী ঝড়ের সময়ে গাছটার মাথায় বাজ পড়ে আগাগোড়া পুড়ে গেল। একটা বাজে যে অত বড় একটা গাছকে পুড়িয়ে আঙার করে দিতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

—তারপর?

—তারপর সেই আঙার ঝড়ে-জলে ভেঙে পড়লো, ঝড়-ঝাপটায় কোথায় ছড়িয়ে গেল।

—এখন?

—এখন ও জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার—যেমন দেখলেন।

যেমন দেখলাম!

নিজের মনে মনে বললাম—আমি তো বাপু গোটা গাছটাকেই দেখেছি! অথচ তার কথাও বিশ্বাস না করা শক্ত। লোকটা মিথ্যা বলতে যাবে কেন? এ মিথ্যা বলে তার লাভ কি? এখুনি তো অপরের মুখে প্রতিবাদ হবে।

যেমন দেখলুম। কি দেখলাম! কিন্তু নিজের জাগ্রত দৃষ্টিকেই বা অবিশ্বাস করি কিভাবে? নিশ্চয় দেখেছি তাতে কোন ভুল নেই। ভাবলাম, একবার ফিরে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু ততক্ষণে

গাড়ি অনেকটা পথ এসেছে, তাছাড়া লোকটাই বা কি ভাববে!

তবে—কি দেখলাম? ছায়া না মায়া, না কি! কিন্তু কিছু যে তা নিশ্চয়। তখন মেসের সেই থিওজফিস্ট ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো। ভাবলাম, গাছের ডালে মৃত্যুদৃশ্যের পুনরভিনয় যদি সম্ভব হয়, তবে মৃত গাছটির পুনরভিনয়ই বা কেন অসম্ভব? তা-ই কি! আমার অভিজ্ঞতা কে বিশ্বাস করবে?

লোকটার কথা মনে পড়লো—"যেমন দেখলেন!" যেমন দেখলাম! কি দেখলাম মনের মধ্যে ক্রমাগত আলোড়ন করতে লাগলো, আর তার সঙ্গে তাল রেখে গাড়িখানা অন্ধকার পল্লী-পথ দিয়ে এগিয়ে চলল—গ্রামের দিকে।



সে রাত্রে জাহাজ গিয়ে নোঙ্গর ফেলেছিল আকিয়াবের বন্দরে। যত খালাসীর দল হাত খালি হতেই এসে বসলো চণ্ডীচাচাকে ঘিরে; বললে······চাচা, গল্প শোনাও—।

চণ্ডীচাচা ফর্‌সির নলটা মুখ থেকে সরিয়ে বললেন—কী গল্প শুনতে চাস?

খালাসীরা বললে—তোমার ওসব আজগুবি গল্প আমরা আর শুনতে চাই না। একটা বলো যা গল্পের চেয়েও আশ্চর্য!

চণ্ডীচাচা একটু সোজা হয়ে উঠে বসলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন—তবে শোন, আমাদেরই এই জাহাজে ঘটেছিল এক অদ্ভুত ঘটনা। তোরা তো এসব মানিস্ নে—কিন্তু সত্যিই সমুদ্র হচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবতা; তাকে কাতর হয়ে কিছু জানালে—কিছু প্রার্থনা করলে—তিনি শোনেন। একবার সিঙ্গাপুর যাবার পথে পেলুম আমরা ভীষণ ঝড়। বাতাস যেন হঠাৎ ক্ষেপে উঠে সংহার-মূর্তি ধারণ করলে, সমুদ্রের বুকে তোলপাড় করতে লাগলো। বড় বড় ঢেউয়ের প্রলয়নাচনে আমাদের জাহাজ হুলতে লাগলো যেন মোচার খোলার মতো! পাল ছিঁড়ে কোথায় উড়ে গেল। মাস্তুলটা চড়চড় করে ভেঙে পড়ে গেল, জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে কার সাধ্য!

যাত্রীরা সব জাহাজের খোলের ভিতর গিয়ে ঢুকল। খালাসীরা হাল ছেড়ে দিয়ে প্রাণের ভয়ে যে যার নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলে। মনে মনে সব কাতর হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলো, 'হে ভগবান, রক্ষা কর।'

কিন্তু ঝড়ের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে শুরু হ'ল। জাহাজ বুঝি আর রক্ষে হয় না। 'সামাল সামাল।' 'গেল গেল' রব চতুর্দিকে। জিনিসপত্র বাক্স-বিছানা-ঘটি-বাটি-চৌকি-চেয়ার-থালা-বাসন সমস্ত মিলেমিশে হুড়মুড় করে এক বিকট শব্দে জাহাজের এধার থেকে ওধার পর্যন্ত গড়াগড়ি খেতে লাগলো! ছটাস্-ফটাস্ করে জলোচ্ছ্বাস তেড়ে তেড়ে এসে ডেক ধুয়ে দিয়ে যেতে লাগলো ঃ—সেই সময় মুখ শুকিয়ে কাঁদ কাঁদ হয়ে আমার কাছে এলো জাহাজের পঞ্চানন ঠাকুর। হিঁদু যাত্রীদের রেঁধে দেবার ভার ছিল এর উপর। পাঁচু ঠাকুর কাতর হয়ে বললে—চণ্ডীখুড়ো, আমাকে বাঁচাও। জাহাজ তো তলিয়ে গেল বলে, কিন্তু আমার কী হবে?

বললুম—আর পাঁচজনের দশা যা হবে, তোমারও তাই হবে—ভাবনা কি ঠাকুর? একসঙ্গেই যাওয়া যাক চলো সাগরতলে নেমে—সেখানে আছে বরুণপুরী, সাগর-কন্যার সাতমহলা প্রাসাদ—চাই কি, তোমায় তারা রাঁধুনির কাজে ভর্তি করেও নিতে পারে। পাঁচু ঠাকুর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। কাপড়ের ভিতর থেকে একটা সাদা পেটমোটা কাঁচের বোতল বার করে আমাকে দেখিয়ে বললে—এটার কি উপায় হবে?—এরই জন্যে আমার সবচেয়ে বেশি ভাবনা! কৌতূহলবশে হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি, তার মধ্যে রয়েছে বড় বড় ঝকঝকে নিটোল মুক্তোর গাঁথা এক ছড়া সুন্দর মালা। মুক্তো দুষ্প্রাপ্য! এর দাম অনেক।

বিস্মিত হয়ে পাঁচু ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেসা করলুম—এ তুমি কোথায় পেলে ঠাকুর? এ যে গজমতির হার! রানী-মহারানীদের কণ্ঠেই শোভা পায়।

পাঁচু বললে—সেই যে সেবার সমুদ্রে একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ খালাসীদের হাতে ধরা পড়েছিল—মনে আছে ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু সেটি তো সেইদিনই কেটেকুটে রেঁধেবেড়ে খাওয়া হয়ে গেছল !

পাঁচু ঠাকুর বললে—মাছটি কোটবার ভার পড়েছিল আমার উপর। কেটে ফেলে দেখি তার পেটের ভিতর এই মুক্তোর মালাটা রয়েছে। এতদিন কাউকে বলি নি, চুপি চুপি এই বোতলে পুরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম—দেশে গিয়ে বৌকে দেবো বলে।···

শুনে সেই দুঃসময়েও না হেসে থাকতে পারলুম না। বললুম —তারপর ?

পাঁচু ঠাকুর বললে—কিন্তু সে আশা বুঝি আর পূর্ণ হ'ল না ! আজ যে সঙ্কটের মধ্যে পড়েছি—সকলেরই জীবন সংশয়। কে বাঁচে কে মরে তার কিছুই ঠিক নেই ! মরতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখু হচ্ছে দারুণ এইটে ভেবেই চণ্ডীখুড়ো, যে এমন চমৎকার মুক্তোর মালা-ছড়াটা আমি বৌয়ের গলায় দিয়ে যেতে পারলুম না !

"আরে—আরে—আরে ! সামাল সামাল ! গেল—গেল সব গেল !—" যাত্রীদের আর খালাসীদের আবার এক ভীষণ আর্তনাদ উঠলো। আমাদের জাহাজখানা এবার ঢেউয়ের মাথা থেকে গোঁত্তা খেয়ে শোঁ করে নেমেই বোঁ করে একপাশে কাৎ হয়ে পড়লো।

পঞ্চানন ঠাকুর বললে, "এটা তবে তোমার কাছেই থাক। যদি বাঁচো—গিয়ে আমার বৌকে পৌঁছে দিও। জাহাজ তো ডুবলো বলে ! আমার বাঁচবার কোনই আশা নেই ! আমি একটুও সাঁতার জানি না।"

বললুম—সাঁতার জানলেও বাঁচবার আশা আমারও যে তোমার চেয়ে বেশি কিছু আছে, তা মনে করো না ঠাকুর। এ বহুমূল্য রত্নহার ভগবান যখন অযাচিতভাবে তোমাকে দিয়েছেন, তখন তাঁরই উপর এ মালা রক্ষার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হও।

পাঁচু ঠাকুর অবাক হয়ে ক্ষণকাল ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে—তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে।

পকেট থেকে একখানা কাগজ-পেন্সিল বার করে দিয়ে পাঁচুকে বললুম—শীগ্‌গির তোমার বৌকে একখানা চিঠি লিখে দাও। লেখো—'এই দুর্যোগে আমার বাঁচবার আশা খুবই কম।

লেখো—'যদি মরি—তোমাকে আমার এই শেষ স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে গেলুম। কণ্ঠে ধারণ কোরো। যদি বাঁচি আবার দেখা হবে।...' হ্যাঁ, তোমার নাম-ঠিকানাটা বেশ স্পষ্ট ক'রে লেখো—আর তোমার বৌয়ের পরিচয়টুকুও ওতে বিশদভাবে লিখে দাও।...যেমন যেমন বললুম, তেমন করেই পাঁচু ঠাকুর পত্র লিখলে। চিঠিখানি নিয়ে সেই বোতলের মধ্যে পুরে ছিপি এঁটে সীল করে দিলুম। তারপর, গায়ে লিখে দিতে বললুম—'এই বোতলটি যিনি পাবেন, তিনি যেন দয়া করে অমুক গাঁয়ের অমুকের মেয়ে এবং অমুকের স্ত্রী শ্রীমতী অমুক...দেবীর কাছে পৌঁছে দেন; সমুদ্রবক্ষে আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের এই অন্তিম অনুরোধ।'...পাঁচু ঠাকুর তাই লিখে দিলেন।

তখন পাঁচুকে বললুম, এইবার হাঁটু গেড়ে বসে জোড়হাত করে সমুদ্র-দেবতার স্তব করো...তাঁকে মিনতি করে জানাও... তিনি যেন কৃপাপরবশ হয়ে এই বোতলটি নিরাপদে যথাস্থানে পৌঁছে দেন।

পাঁচু সর্বান্তঃকরণে ভক্তিগদ্‌গদ হয়ে তাই করলে; তারপর 'জয়, সিন্ধুবারিধি বরুণাশ্রয় সাগর মহাদেবতার জয়!' বলে বোতলটি সেই উত্তাল তরঙ্গময় ফেনিলোচ্ছল সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করা হ'ল।

ছ'মাস পরের কথা। সেদিনের দুর্যোগ কাটিয়ে আমাদের জাহাজ যথাসময়ে সিঙ্গাপুরে পৌঁছেছিল। পাঁচু ঠাকুর সশরীরে

বেঁচেছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে আর কথা হয় নি। পাঁচজনের কাছে বলেছে শুনলুম—আমার বুদ্ধি শুনেই নাকি তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। দশ হাজার টাকা দামের মুক্তোর মালা আমার কথায় বোকার মতো সে জলে ফেলে দিয়েছে।

একদিন শুধু তাকে বলেছিলুম—ঠাকুর! ব্রাহ্মণ তুমি, দেবতার উপর বিশ্বাস রেখো। দেবতার কাছে যে ধন গচ্ছিত রেখেছ, সে কখনও খোয়া যাবে না।

জাহাজ ফিরতিবেলায় চাটগাঁয়ে আসতেই পাঁচু ঠাকুর ধড়ফড়িয়ে জাহাজ থেকে নেমে দেশে চলে গেল। জাহাজের কাজে সে ইস্তাফা দিয়ে গেছলো। তাই পাঁচুর সঙ্গে অনেককাল আর আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। হঠাৎ একদিন এই আকিয়াবে এসেই আমি তার একখানা চিঠি পেলুম। তাতে সে লিখেছে দেখলুম—

"খুড়ো, তোমার পায়ে কোটি কোটি নমস্কার! তুমি জাহু জানো। হয় তুমি দেবতা—নয় তুমি জীন। নইলে এ কখনো সম্ভব হ'তে পারত না! সমুদ্র কথা শোনে দেখছি! মানুষের অনুরোধ রাখে। তার কাজও করে দেয়! কিন্তু সে কেবল তোমারই কথা শোনে চণ্ডীচাচা! সকলের নয়।

ব্যাপারটা শুনে তুমি হয়তো একটু আশ্চর্য হবে। কারণ, তোমার বিশ্বাস যেমনি দৃঢ় তেমনি অবিচলিত। কিন্তু খুড়ো, আমি একেবারে স্তম্ভিত—বিস্মিত—হতবুদ্ধি। দশ হাজার টাকা দামের মুক্তোর মালাটা—তোমার কথা শুনে নির্বোধের মত জলে ফেলে দিয়ে মন আমার একেবারে অত্যন্ত খারাপ হয়ে মুষড়ে পড়েছিল। যত রাগ গিয়ে জমা হয়েছিল তোমারই উপর। মনে হয়েছিল—তুমিই শয়তানি করে আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষাবশতঃ আমাকে বোকা বুঝিয়ে মুক্তোর মালা জলে ফেলে দিয়েছিলে।

কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য দয়া! শুনে খুশী হবে চণ্ডীখুড়ো

যে, তিনি যথাসময়ে স্বয়ং একেবারে আমার স্ত্রীর কাছে মালা এনে পৌঁছে দিয়েছেন। অথচ আমার বাড়ি থেকে সমুদ্র কতদূরে জানো ?···অন্ততঃ তিনশ' মাইল দূরে। তবু কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল শুনবে ?···

সেটা ছিল আষাঢ় মাস। পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার ধুম লেগেছে। আমাদের গাঁয়ের একদল মেয়ে গোসাঁইজীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল 'রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' করবার জন্যে শ্রীধামপুরীতে। আমার স্ত্রীও সেই দলে ভিড়েছিলেন।

রথের দিন সেখানকার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তিনি ঢেউয়ের টানে একটু বেশিদূর চলে যান। তারপর আবার ধাক্কা খেয়ে তীরের দিকে ফিরে এসে দেখেন কুমীর নয়, সেই মুক্তোর মালা-ভরা পেটমোটা সাদা কাঁচের বোতল।

বোতলের গায়ে লেখা পড়ে আমার স্ত্রী তো অবাক! কী ভাগ্যি, সে বুদ্ধি করে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে বোতলটি বাড়ি এনেছিল। ভিতরের চিঠি পড়ে সবই বুঝলে। আমার স্ত্রী বলে—অমন হয়। দেবতারা দয়া করলে নাকি সবই করতে পারেন। আর কি লিখবো ? আমাকে ক্ষমা করো! সশ্রদ্ধ প্রণাম নাও। ইতি—

তোমাদের—পাঁচু ঠাকুর



ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং। টেলিফোনের ঘণ্টা বাজছে পাশের ঘরে।

গ্রাহ্য করি নি, সবে ফলাও করে গল্পটা ফাঁদছি এমন অসময়ে কি না ক্রিং? গল্প আমার আবার একটা খুনের গল্প।

"প্রান্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রকয়িতে ডুক্রিং করনে"—

আচার্য শংকর একথা বলে গেছেন; কিন্তু বললে কি হবে, খুনো-খুনির মুখোমুখি এসেও অক্ষুণ্ণ থাকা যায় না, আমি অটল থাকিলেও ঐ Do-ক্রিং করনে বিনিকে টলিয়েছে। সে এসে জানায়—"মলয়বাবু ডাকছেন তোমায় ফোনে, খুব জরুরি নাকি!"

মলয়ই দেখছি গল্পটাকে হত্যা করবে, আমার আগেই। "কাগজময় ইকরি মিকরি কী সব আঁকা হচ্ছে! শৈলবাবুকে টেক্কা মারবার অপচেষ্টা?" বিনি জিজ্ঞেস করে।

"একটা ছক কাটছিলাম, গল্পের ম্যাপ আর কি! কিভাবে শুরু হয়ে কোথায় গিয়ে কদ্দূর গড়াবে জিনিসটা—তারই একটা নকশা।"

কী—জিনিস?"

"এই—এই খুনখারাপি।"

"খুন।" বিনিই যেন জখম হয়।

"কেন, আমি খুন করতে পারি নে? করলে কী হয়, খুন করা কি খারাপ! না, করতে নেই আমার?"

"খুন করবে—কাকে গো!"

"আমার গল্পের নায়ক-নায়িকাদের। আবার কাকে!"

"ও, তাই বলো। গল্পের খুন। আমি বলি কী না।" ও নিশ্বাস ছাড়ে, স্বস্তির নিশ্বাস।

ছেড়ে, একটু থেমে পুরানো কথাটাই বলে পুনরায়—"মলয়বাবু ডাকছেন।"

"শুনি গে," ব'লে উঠি। আমার পাত্র-পাত্রীদের মরণের মুখে রেখে অবাঞ্ছিত CALL—কোলাহলে যোগ দিতে হয়।

"মলয়, কী খবর হে?"

"আ মি—আ মি—আ মি—" খানিক আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে সে বলল, "আমি খুন করতে চলেছি।"

"য়্যা—?" নিজের কানকে বিশ্বাস করা যায় না—"ইয়ার্কি হচ্ছে?"

"না, সত্যিই। সত্যি আমি খুন করবো। খুন না করলে আমার শান্তি নেই—বাঁচবো না আমি।" গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় পরিহাস নয় ওর।

"না খুন করতেই হবে আমায়।" মলয় জানায়,—"আর—আর—এ সুযোগ একবার গেলে—না, এ হারানো চলবে না আমার।"

সর্বনাশ! আমি ব্যস্ত হয়ে উঠি—

"খুন করেচো, না, করো নি এখনো?"

"না, এখনো না। রওনা হচ্ছি এই। যাচ্ছি করতে।"

"এক্ষুণি চলে এসো আমার এখানে—চট ক'রে।"

"কেন বল তো?"

"আমি বাধা দেব।"

রিসিভার রেখে দিয়ে মলয়ের অপেক্ষা করি, বিনি বলে, "ভালোই হলো দাদা," কি ক'রে খুনের গল্প লিখবে ভেবে মরছিলে, কত সোজা হয়ে গেল এখন! মলয়বাবুর সত্যি ঘটনাটা লিখে দিলেই চুকে যাবে।"

হুম্।......খুনের কথায় আমি গুম হই।

"এতদিন তোমার গল্প পড়ে হেসে খুন হয়েছে লোকে—বেশির ভাগ অবশ্যি বালকেই—"

"যা যা, বকিস নে।"

"এখন তোমার খুনের গল্প পড়ে হাসবে, মন্দ কি?"

মলয় আসামাত্র আমি বাধা দিতে লাগি—'শোনো মলয়, খুন করা অতিশয় খারাপ। কদাচ মিথ্যা বলিও না, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়ো না, কখনো কাহাকেও গালি দিয়ো না—ইত্যাদির মতই খারাপ। এমন কি, ইত্যাদির চেয়েও। বলতে পারো, দ্বিতীয় ভাগে একথা লেখা নেই;—কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই এতদিন বেঁচে থাকলে তৃতীয় ভাগের গোড়াতেই এই বাক্যটি লিখে রাখতেন নিশ্চয়ই। ভেবে ছাখো, কেউ যদি তোমার প্রাণ নিতে আসে, তাহলে কী হয়? কিংবা প্রাণ নয়, কেবল একটা কান মাত্র। তাহলে কেমন লাগে তোমার? কেউ যদি তোমার কান নিতে আসে—"

"আমি তাকে বলবো, দোহাই, আমাকে একেবারে প্রাণে মারো, কানে মেরো না, কানহীন হয়ে এপৃথিবীতে আমি বাঁচতে চাই নে।" মলয় জানায়।

"তাহলে বোঝো, কেবল একটা কান গেলেই প্রাণে কতো লাগে! আর তুমি একজনের চোখ, কান, নাক, মুখ, দাঁত, পায়ের আঙ্গুল

ইত্যাদি সব সমেত আস্ত—তাকেই লোপাট করতে চাইছো, তাতে তার কিরূপ লাগবে, কত দুর্বিসহ যাতনা হবে। সেটা ভেবেচো ? ভেবেছো সেটা একবার ?"

"যাতনা ? একদম না। তাকে আমি এমন কায়দায় মারবো যে দেখতে না দেখতেই খতম। টেরও পাবে না সে। ভাল কথা, কেউ যদি তোমার কানে নিতে আসে—"

"আমি তার কথায় কান দেব না।" আমি বলি।

"কি করবে ?"

"পালাবো।"

"এ বেচারীর কিন্তু পালাবার পথ নেই। এমন জায়গায় এনে খাড়া করেছি, সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালানো যায় না। একেবারে কোণঠাসা। খালি একটিমাত্র পথ খোলা। সে পথে শুধু পতন ও মৃত্যু।"

"কাকে খুন করতে যাচ্ছো শুনি ? কাকে ?

"আমার কাকাকে ?"

"কাকে বললে ?"

"খুড়োকে। হাতে কাজ না থাকলে যার গঙ্গাযাত্রা করার সামাজিক বিধি আমাদের।"

"খুলে বল সব।"

মলয় খোলসা করে। তার এক খুড়ো। একমাত্র খুড়ো। অগাধ টাকার মালিক। বাহাত্তুরে বুড়ো। তার ওপর মারা গিয়ে অক্লেশে তাকে বড়লোক করতে পারে, কিন্তু মরবার নামটি নেই! তার আবার এক বিচ্ছিরি সখ—ফি বছর পূজোর সময়—

কবে এক মহাদশমীর দিন তিনি দার্জিলিঙে জন্মেছিলেন। এখন, কয়েক বছর ধরে নিজের জন্মতিথি পালন করার উৎসাহ হয়েছে তাঁর। পূজোর মুখেই দার্জিলিঙে যাওয়া চাই তাঁর, আর একলা নয়, মলয়কে সাথে নিয়ে, কোথায় মলয় পূজোর সময় কলিকাতায় ফুর্তি লুটবে, না

যাও দার্জিলিং। না গেলেও চলে না, মরার আগে যদি বুড়ো মেরে যায়? ত্যাজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ক'রে যায় তাকে, এই ক'রে পর পর পাঁচটা বছর মলয়ের তিনি মাটি করেছেন, পূজোর মুখ দেখতে দেন নি, কিন্তু এবার আর না—এবারেই শেষ। আমি বলি—"অমন কাজটি কোরো না মলয়। পরের মন্দ করতে গেলে আগে নাকি নিজের হয়। আর ভেবে দেখলে তুমি নিজেও একদিন বুড়ো হবে, এবং চাই কি, হয়তো খুড়োও হ'তে পারো। তখন ভাইপোর হাতে মারা যাবার জন্যও তো তোমার বেঁচে থাকা দরকার। কিন্তু এখন খুনখারাপিতে জড়িয়ে পড়লে আর কিছু যদি নাও হয়, তোমার ফাঁসি তো হবেই নির্ঘাত।"

ফাঁসি? ফাঁসি হলে তো! খুন করবো কিন্তু কোনো চিহ্ন রাখবো না। টের পাবে না কেউ। হদিশ থাকবে না কোথাও। এমন নিখুঁত হত্যাকাণ্ড কোনো গোয়েন্দা কাহিনীতেও কখনো পড়ো নি। পুলিশের বাপের সাধ্যি নেই যে এ খুনের কিনারা করে। কেমন করে ঘটবে, বলি তোমায় শোনো। বলে সে শুরু করে, "বুড়ো বয়সে লোকে বাতে মরে, এ মরবে বাতিকে। বুড়োর এক বদ্ খেয়াল আছে। দশমীর দিন বিকেলে উনি বেড়াতে বেরোন। আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়। একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে উনি জংলি লতাপাতা কুড়োন। ঘড়ি ধরে একেবারে কাঁটায় কাঁটায়।"

"ঘড়ি ধরে কেন? জিজ্ঞেস করি।"

"ঠিক যে সময়টা উনি জন্মেছিলেন। জন্মতিথি আর জন্মক্ষণ একসাথে পালন করেন আর কি! তারপরে খুড়ো সেই তৃণগুচ্ছ, লতাপাতা আর ফুলটুল অঞ্জলি করে সার জন্মক্ষণটিতে মাতা ধরিত্রীকে তিনি উপহার দেন। একেবারে ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায়।"

সময় নিষ্ঠার এক দৃষ্টান্তে, ঘড়ির মত আমার গায়েও কাঁটা দেখা দেয়।

"তারপর ?"

"তারপর আমরা ফিরে আসি, অবশ্যি উনি আমাকেও ডাকেন ওর সঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে, ফুলপাতা কুড়িয়ে ধরিত্রী মাতাকে অঞ্জলি দেবার জন্যেই; কিন্তু আমার উৎসাহ হয় না, তাঁর ধারে-কাছেও আমি কখনো যাই নে। গত পাঁচ বছর ধরেই ঠিক এই কাণ্ডটি ঘটছে! বাঁধাধরা অনুষ্ঠানের মতই।"

"ওঁর জন্মোৎসবে যোগ না দিয়ে ভালো করো নি—" না বলে আমি পারি নে, "অন্ততঃ ওর উইলের দিকে নজর রেখেও এটা তোমার কর্তব্য ছিলো, কখনোই কি ওঁর জন্মক্ষণটিতে তুমি পুষ্পাঞ্জলি দাও নি ?"

"কক্ষনো না।" প্রত্যেক বছরই উনি ডেকেছেন—কিন্তু আমি কানে তুলি নি। আদৌ সাড়া দিই নি ওঁর ডাকে, আমার ব্যবহারে উনি হতাশ হয়েছেন, টের পেয়েছি স্পষ্টই, তবুও ওঁর কাছে যাই নি আমি—তবে এবার যাবো।"

"বুঝেছি! আমি ঘাড় নাড়ি এবার তোমার শেষ যাত্রা!" হ্যাঁ, এবার আমি অঞ্জলি দেব, তবে তৃণ-গুল্ম নয়—ওঁকেই এবারের দশমীতেই বোধন আর বিসর্জন দুই-ই।" আমি আবার বাধা দিই, ওকে বোঝাতে চেষ্টা করি, কিন্তু মলয় অবাধ্য—যেমন চিরদিনই। ও বলে, "না ভাই, আমাকে বারণ কোরো না, করে লাভ নেই, বছরের পর বছর এ দুর্ভোগ আর আমার সয় না। বুড়ো হয়তো এখনো বিশ বছর বাঁচবে, বার্ণার্ড-শর মত তিনশ' বছরও বাঁচতে পারে—কে জানে! আর ততদিন ধরে পূজোর আমোদ খোয়াতে আমি পারব না, আমার জীবনটাই বরবাদ করে দেবে ও, নাঃ, আর দেরি চলে না। এক্ষুনি আমাকে কাকার বাড়ি যেতে হবে, সেখান ওঁকে নিয়ে শেয়ালদা, দার্জিলিং মেল ধরতে। পাড়ার বারোয়ারী পূজোর পাণ্ডা আমি—পরশু থেকে পূজো শুরু—অথচ আজ আমায় দার্জিলিং যেতে হচ্ছে, ও হো হো!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁদো কাঁদো মুখে সে বিদায় নেয়। এর পরের ঘটনা, অকুস্থলে উপস্থিত না থাকলেও, আমি বলতে পারি। প্রায় বর্ণে বর্ণেই বর্ণনা করা যায় বোধ হয়।...

মহাদশমীর সেই মারাত্মক দিনটি এলো। বেলা গড়ালো বিকেলের দিকে মলয়ের কাকা মলয়কে ডেকে নিয়ে বেরুলেন, ফি বছরের মত এবারো ঘড়ি ধরে। মলয় গোমড়া মুখে আশান্বিত মনে তার পিছু পিছু চলে।

চলতে চলতে তাঁরা দার্জিলিং-এর এক মানবহীন জায়গায় এসে দাঁড়ালেন সেই খাদের ধারটিতে, মলয়ের কাকা ঝুঁকে পড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফুলপাতা কুড়োতে থাকেন, আর ঘড়ির দিকে তাকান, মলয়ের দিকেও মাঝে মাঝে, মলয়ও তাকায়, তাকায় আর তাক্ খোঁজে। অবশেষে সেই মহালগ্ন এলো—কাকার—জন্মক্ষণ। জন্মক্ষণ বা মৃত্যুক্ষণ, যাই হোক!

মলয় বুক বাঁধে। কাকস্য পরিবেদনা?

এখন কাকার ডাকার অপেক্ষা কেবল। মলয়ের বুক টিপটিপ করে।

কাকার ডাক আসে। মলয় কাকার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বুকের টিপটিপুনির জোর আওয়াজ এত, যেন কান পাতলেই শোনা যায়। খাদের ধারটাতে গিয়ে সে খাড়া হয়, তলার দিকে ঝুঁকে তাকাতে গিয়ে সারা দেহ যেন তার মড়মড় করে ওঠে। উঃ, কী গভীর খাদ! এর মধ্যে তাকালে কি কেউ বাঁচে? তলানি থাকে কোনো?

হঠাৎ তার কাকা ফিরে তাকান পূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে। তার চোখের ওপর চোখ রাখেন। চারি চক্ষের মিলন হয়। তার পর—তারপর সব শেষ।

বিচ্ছিরি একটা চিৎকার। দেহটা বাতাসে লাট খেতে খেতে পড়ে—পড়তে থাকে অতলস্পর্শী খাদের নিরুদ্দেশে।

নিখাদ সোনার মতই নিখুঁত খুন।

শুধু একটু ভুল করেছিলো মলয় বসু। তার পিতৃব্যের প্রতি, দিনের পর দিন, যেমন তার বিরাগ জমেছিলো, তার ওপরেও তার যে তেমনি পিত্তি চট্‌তে পারে সেটা সে ভেবে দেখে নি! বছরের পর বছর দশমীর উক্ত দিনক্ষণে খাদের কিনারায় গিয়ে জননী বসুন্ধরার উদ্দেশে অঞ্জলি দেবার জন্য তাকে ডাকায়, নিজের জন্মোৎসব ছাড়াও গভীরতর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো হয়তো। তার মত তার কাকাও বুঝি চেয়েছিলেন—

জানি, অচিন্ত্যনীয় এই খুন।

এ খুনের কিনারা করা কঠিন তাও আমার জানা আছে।

এর রহস্য কে আর গভীর খাদের গর্ভে তলিয়ে দেখতে যাবে—বলো?

হ্যাঁ, নিখুঁত খুনই বটে; তবে মলয় করে নি। করেছেন ওর কাকা, মা বসুন্ধরাই আরেকটি বসুকে ধারণ করেছেন, মলয় বসুকে।

হ্যাঁ, আমাদের মলয়……হাওয়া।

———



পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড় মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড় মামা ওটাকে খুব সস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেন নি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজ মাসিমা একবার বলেছিলেন বটে "নাই বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন?"

বড় মামা রেগেমেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দু'জন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্য আরামে দু' রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সব কথা ভেঙে বলা হয় নি। তারা দু'বেলা মুর্গী খাবার লোভে মহাখুশি হ'য়েই থাকতে রাজী হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড় মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। "যদি কিছু হ'ত

দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!"

দু'মাস পরে বড় মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কু ঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলে নি ; আর গেল নটবর বেয়ারা, তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে বিকেলে আধঘণ্টা করে দুটো আধমণি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার-পাঁচ বার জেল খেটে এসেছে গুণ্ডামি-টুণ্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলী হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হ'ল মুশকিল। বড় মামা তাই শুনে বললেন—কুছ্ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরও পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বন্ধুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না। ভালোই হ'ল।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হ'ল। মা'রা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড় মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল, আর আমিও সারাদিন স্কুল ক'রে বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, মা'রাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাশের জগু আর ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে, স্কুলে টেকা দায় হয়ে উঠেছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল, কিন্তু পূজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা আমার সঙ্গে এমন ছোটলোকের মত ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারী। সেদিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা কাটাকাটি

হয়ে গেছে ; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্‌ ক'রে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনটা একটু খারাপই ছিল। একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর, ঝগড়ু আর নটবর তক্‌তকে ক'রে রেখেছে। প্রায় সবগুলোই খালি, শুধু নীচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দোতলায় ছুটো শোবার ঘরে বড় মামা কয়েকটা দরকারী আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড় মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নীচে থেকে বঙ্কুর রান্না লুচি-আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ ; আমগাছ, কাঁঠালগাছও গোটা কতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবাফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর ছু'জন আমার চেয়ে একটু বড় হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বললে, পিছন দিকের পুকুরে আমাকে মাছধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলে ছুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাকরবাকর-দের এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হ'য়ে গেল। আমাকে সাপ কামড়ানর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ এই সব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরতো। আর দোতলায়

একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সে কথা জানাতেই, যেদিনই মামা বেরোতেন, সেদিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকাডুবির কথা, কুমীর আসার কথা, হাঙ্গর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হ'ল যে, ঐ জগু, ভুটে আর নেলে বলে ওদের যে এক সাকরেদ জুটেছে, এই তিনজনকে অন্ততঃ আচ্ছা ক'রে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে—"বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।"

বললাম—"না-রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে, বাছাধনদের চুলদাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।" তাই শুনে ওরা তিনজনেই হেসেই লুটোপুটি।

আমি বললাম—"দেখ্‌, তোদের তিনজনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে গুজিয়ে দেব।"

"অ্যাঁ! সেজিয়ে গুজিয়ে দেবেন কেনে বাবু? রংটং মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি ক'রে হাত লাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের পিলে চমকে যাবে।" ছেঁড়া চাদর ধুতি যা পেলাম তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারলাম না! ভালোই হবে, তা হ'লে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়িটার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে! "কি রে, হতভাগা, ভারি লাটসায়েব হয়েছিস যে? কথা বলছিস না যে বড়?"

বললাম, "মেয়েদের সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না।

ব্যাচেলর মামার শিক্ষা।" তারা তো রেগে কাঁই—"মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?"

বললাম, "যারা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কা তফাত?"

জগু রাগে ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে বলল—"যা মুখে আসবে, খবরদার বলবি না, গুপে।"

"একশ' বার বলব, তোমরা ভীতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ।" জগু আমাকে মারে আর কি! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে—"সন্ধ্যেবেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব। দেখি তোমাদের ভূতের দৌড় কতখানি! হুঁ, আমাদের চিনতে এখনও তোমার ঢের বাকি আছে।"

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে একটু এদিক ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছনে থেকে গুজি ডেকে বলল—"বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জগু, ভুটে, নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড় মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, "বন্ধুদের কেষ্টনগরের মিষ্টিটিষ্টি দিস্, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।" কথাটা যেন না বললেই হ'ত না। ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি, যেন ভারি রসিকতা হ'ল।

বড় মামা গেলে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন! চারিদিকে অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কী রকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে, আমারই গা ছমছম করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারে সেই সরু

রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্য ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে—"তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার জায়গা পাস নি!"—বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কী ক'রে করবে? ছোঁয়ামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুরঝুর ক'রে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্ছা গেল।

আমি পাগলের মত "ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি" ক'রে ছুটে বেড়াতে লাগলাম। গাছের পাতার মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হ'ল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে-মুখে জল দিল। আমার গায়ে মাথায়ও মিছিমিছি এক বাল্‌তি জল ঢালল।

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হ'ল। এসেই আমাকে কি বকুনি!

"বল্‌ লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?"

যত বলি শিবু সিজি গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোন দিনও দেখে নি শোনে নি; এ আবার কী কথা? আন্‌ তা' হলে তাদের খুঁজে। কিন্তু তাঁদের কি আর কখনও খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুরঝুর ক'রে কর্পূরের মত উবে গেছে।

———



প্রতিশোধ

গজেন্দ্র কুমার মিত্র

পৃথ্বীরাজ চৌহানের নাম এদেশে কে না শুনেছে! পিথ্বীরাজ আর সংযুক্তার কাহিনী ভারতের ঘরে ঘরে প্রবাদ-বাক্যের মতোই প্রচলিত। সেই পৃথ্বীরাজের সঙ্গে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের মাঠে মুহম্মদ ঘুরীর প্রচণ্ড লড়াই হ'ল। পৃথ্বীরাজ দুর্ধর্ষ বীর কিন্তু মুহম্মদ ঘুরীও সুনিপুণ সেনাপতি—তাই ভারতীয় বাহিনীরই পরাজয় ঘটল এবং পৃথ্বীরাজ ও তাঁর ভাই দু'জনেই নিহত হলেন।

এই হ'ল ইতিহাসের কথা।

কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, পৃথ্বীরাজ একেবারে নিহত হন নি—গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন মাত্র। আর সে খবর পাবার পর মুহম্মদ ঘুরী তাঁর বীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে বধ করতে দেন নি, বরং হাকিম ডেকে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ ক'রে তুলেছিলেন। তাই ব'লে ছেড়েও দেন নি, চিরকাল বন্দী হিসেবে কাছে কাছে রেখে দিয়েছিলেন—সম্ভবত নিজের যোদ্ধা-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-গৌরবের

স্মারক হিসেবেই। তবে তখনকার কালে যা রেওয়াজ ছিল, বিশেষত মুসলমান রাজাদের—সিংহাসনের সমস্ত সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্ধ ক'রে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন তাঁরা, যাতে সুযোগ পেলেও কোনদিন আর কেউ তাদের সিংহাসনে বসাতে না পারে—সেটুকু করিয়ে নিতে ভুলে যান নি মুহম্মদ ঘুরী। কোন দেশেই কোন কালে অন্ধদের সিংহাসনে বসবার অধিকার নেই।

এর পর অন্ধ পৃথ্বীরাজ নাকি অনেকদিন বেঁচে ছিলেন আর বরাবরই—মুহম্মদের মৃত্যু পর্যন্ত—সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। একথা বহু রাজপুত ঐতিহাসিক লিখে গেছেন—দু'-একজন বিশিষ্ট মুসলমান ঐতিহাসিকও তা সমর্থন করেছেন।

আরও একটা কথা বলেছেন তাঁরা—এই অন্ধ রায়পিথৌরাই নাকি শেষ পর্যন্ত ঘুরীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন! এই সুযোগটুকুর জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন নাকি তিনি—নইলে এত নির্যাতন সহ্য করার মতো মানুষ তিনি ছিলেন না।

আর সেই নির্যাতনেরই নাকি শোধ তুলেছিলেন পৃথ্বীরাজ। স্বহস্তে মুহম্মদ ঘুরীকে বধ করে। শত্রুকে ছোট ক'রে দেখতে নেই কখনও—শত্রুর শেষ রাখতে নেই—চাণক্যের এই নীতিই নতুন ক'রে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কেমন ক'রে কী হ'ল এর বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে নেই। আমার গল্প ইতিহাসের সেই অলিখিত পাতা ক'টা নিয়েই।

পৃথ্বীরাজকে যখন অন্ধ করা হয়, তখনও তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। এত বড় সর্বনাশের কথাটা তিনি জানতে পারেন নি। যখন পারলেন তখন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চেঁচামেচি করলেন না, রাগারাগিও করলেন না। গালিগালাজ অভিসম্পাতের একটি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। এসব ক্ষেত্রে মানুষ যা করে, এতকাল যা দেখে এসেছে—তার কোনটাই তাঁকে করতে না দেখে পৃথ্বীরাজের পাহারাদার রক্ষীরাও অবাক হয়ে গেল। এমন কি তারা যেটা মনে করেছিল যে, এবার হয়তো পৃথ্বীরাজ আত্মহত্যার চেষ্টা করবেন—সে

আশঙ্কাও ব্যর্থ প্রমাণিত হ'ল। পৃথ্বীরাজ শান্তভাবেই আহার্য গ্রহণ করলেন, হাকিমের দেওয়া ওষুধও খেলেন নির্বিবাদে। অবশ্য তাঁকে সেবা করবার জন্য, পথ্য রেঁধে দেওয়ার জন্য হিন্দু চাকর জনা-দুই রেখেছিলেন মুহম্মদ ঘুরী কিন্তু বিধর্মী পরিবেশে, তাদেরই আনা এবং ছোঁওয়া তো বটেই– তাদের তাঁবুতে রান্না করা খাবার খাওয়া সে যুগেও হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তার ওপর হাকিমের ওষুধ, কী দিয়ে তারা কি তৈরি করে তারও ঠিক নেই। ভাল করে জ্ঞান হবার পরও, কোথায় কিভাবে আছেন সব জেনেও যখন তিনি ধীরভাবে নিজের ভাগ্যকে মেনে নিলেন, তখন গজনীর সৈন্যবাহিনীর অনেকেই অবাক হয়ে গেল। তারা অল্পদিন ভারতে এলেও এদেশের গোঁড়ামি এবং জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের এটুকু পরিচয় পেয়েছে বৈকি। এদের আর যা-ই দোষ থাক—প্রাণের মায়া নেই, ধর্ম বিসর্জন দেওয়ার থেকে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াটা এদের পক্ষে ঢের সহজ।

তবে কি—কেউ কেউ এমন কথাও ভাবতে শুরু করলেন—তবে কি পৃথ্বীরাজ চৌহান বড় যোদ্ধা হ'লেও আসলে কাপুরুষই ?...

অবাক হয়েছিলেন মুহম্মদ ঘুরীও। তিনি প্রত্যহই বন্দীর খবর নিতেন। তাঁরও ভয় ছিল যে জ্ঞান হবার পর বন্দী একটা ভয়ানক কাণ্ড কিছু ক'রে বসবে। যখন শুনলেন যে সে-সব কিছুই করেন নি পৃথ্বীরাজ—তখন বেশ একটু চিন্তিত হলেন। তিনি নির্বোধ নন—পৃথ্বীরাজকে কাপুরুষ ভাববার মত বোকামি তাঁর ছিল না।

পৃথ্বীরাজের জ্ঞান হবার পরও অনেক দিন অপেক্ষা করলেন মুহম্মদ ঘুরী। তারপর—তিনি সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, তাঁবুর মধ্যেই চলাফেরা করছেন খবর পেয়ে—একদিন তাঁর সামনে পৃথ্বীরাজকে আনতে হুকুম দিলেন। একটু যেন ভয়ে ভয়েই দিলেন। নির্দেশ দিলেন যে কোথাও কোন অস্ত্রশস্ত্র তাঁর পোশাকের মধ্যে লুকানো আছে কিনা দেখে, বেশ কড়া পাহারায় ঘিরে যেন আনা হয়। অন্ধকেও বিশ্বাস নেই তাঁর।

পৃথ্বীরাজ এলেন কিন্তু শান্তভাবেই। পরাজিত নৃপতির প্রতি সৌজন্যবশত মুহম্মদ ঘুরী তাঁর হাতের বাঁধন খুলে একটা আসন দিতে বললেন, কিন্তু রক্ষীদের ইঙ্গিত করলেন যথেষ্ট সতর্ক থাকতে। পৃথ্বীরাজ টের পেলেন না—তাঁর চারিদিকে অন্তত কুড়িটি তরবারি বর্শা বল্লম উদ্যত রইল।

পৃথ্বীরাজ অবশ্য করলেনও না কিছু। নির্দিষ্ট আসনে বিনীতভাবেই বসলেন। মুহম্মদ ঘুরীর কুশল প্রশ্নের জবাব দিলেন বেশ ধীর-ভাবে। এমনটা আদৌ আশা করেন নি মুহম্মদ ঘুরী ; এ তাঁর হিসেবের সঙ্গে একদম মিলছে না।···অথচ মানুষের হিসেবে তো তাঁর কখনও ভুল হয় না এমন—! অবশেষে আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না ঘুরী ; প্রশ্ন করলেন, আপনার আহারাদির জন্য ব্রাহ্মণ পাচক খোঁজ করেছিলাম, পাই নি। অবশ্য হিন্দু দু'জনকে রাজী করতে পেরেছি। আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?

পৃথ্বীরাজ একটু হাসলেন। বললেন, বন্দীদশা হ'ল আপৎকাল। এসময়ে কোন নিয়মই খাটে না। আমি আপনার অধীন, আপনার অন্ন গ্রহণ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে আচার নিয়মের কথা ভাবলে চলবে কেন ?

তখন কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেন মুহম্মদ ঘুরী। বললেন, আপনার মতো সৎবুদ্ধি সকলের থাকে কৈ ? আমরা আর একজন হিন্দু সেনাপতিকেও বন্দী করেছিলাম। তিনি কিছুতেই স্বজাতির রান্নাও খেতে রাজী হলেন না। উপবাস ক'রে প্রাণ দিলেন তবু মুখে কিছু তুললেন না।

বারেকের জন্য পৃথ্বীরাজের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হয়েছিল কি ?

হলেও মুহম্মদ ঘুরী তা টের পেলেন না। পৃথ্বীরাজ মাথাটা ঈষৎ নিচু করে শান্তভাবেই বললেন, তিনি ভুল করেছিলেন। আমাদের শাস্ত্রের নির্দেশ ঠিক বুঝতে পারেন নি। আত্মহত্যা সকল অবস্থাতেই মহাপাপ। মানুষ জন্মগ্রহণ করে সুখ-দুঃখ সবই ভোগ করার জন্য।

সবটাই সহজভাবে ঈশ্বরের দান বলে মাথা পেতে নেওয়া উচিত। আত্মহত্যা করলে প্রকারান্তরে তাঁর প্রতিই অবিচারের অভিযোগ করা হয়—ঈশ্বরকে অপমান করা হয়।

কেয়াবাত! কেয়াবাত! অজস্র সাধুবাদ দিয়ে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী। সামনে এসে পৃথ্বীরাজের হাত দুটো ধরে বললেন, আপনাকে বীর যোদ্ধা ও নিপুণ শাসক বলেই জানতাম। এখন দেখছি পাণ্ডিত্য এবং নির্মল বিচারবুদ্ধিতেও কম যান না! আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে আমার অনুচররা তার জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। এখন এ অবস্থায় যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আপনাকে দেওয়া সম্ভব আমরা তা দেবার চেষ্টা করব। আপনিও দয়া করে আপনার যখন যা প্রয়োজন জানাবেন।

পৃথ্বীরাজ তেমনি শান্তভাবেই ঘাড় নেড়ে বললেন, যে আজ্ঞে, জানাব।

এই হ'ল ওঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত।

এর পর যতদিন যেতে লাগল পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন মুহম্মদ ঘুরী। এমন নির্মল সহজ বুদ্ধি, এমন সৌজন্য, এমন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া —তিনি আর দেখেন নি। এতকাল মধ্য-এসিয়ার পার্বত্য যাযাবর লোকদের সঙ্গেই তাঁর কারবার—তারা শিক্ষা সংস্কৃতি কোন কিছুরই ধার ধারে না, তারা শুধু জানে মানুষ মারতে, লুঠ করতে, ঘর জ্বালাতে—শিক্ষিত সংস্কৃতিবান স্থিরবুদ্ধির লোক কেমন হয় তা তাঁর জানা ছিল না; তাই তিনি আরও অবাক হয়ে গেলেন পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মিশে। শেষে এমন হ'ল যে প্রতিদিন কিছুক্ষণ ক'রে পিথৌরার সঙ্গে গল্প না করলে চলে না তাঁর। শুধু আনন্দ নয়—পিথৌরার সাহচর্যে উপকারও হ'ত তাঁর, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু উপদেশ এবং জ্ঞানও লাভ করতেন।

দেশে ফেরবার আগে ওঁকে এখানে রেখে যাবেন হয়তো আগে এই সংকল্পই ছিল ঘুরীর, কিন্তু যাবার সময় আর সে ইচ্ছা রইল না। তিনি পৃথ্বীরাজকে নিয়েই দেশের দিকে রওনা হলেন। পৃথ্বীরাজ এখন ঘোড়ায় চড়তে পারেন। তাছাড়া তিনি মালিককে না বলে পালাবেন না কথা দিয়েছেন—সেজন্য খুব কড়া পাহারারও দরকার নেই। তবু মুলতান ছাড়বার আগে বোধ হয় একটু বিবেকে লেগেছিল—জিজ্ঞাসা করেছিলেন ওঁকে মুহম্মদ ঘুরী, আপনি কি মুক্তি চান? বলুন, তা হলে আমি আপনাকে দিল্লীতে পৌঁছে দেবার বন্দোবস্ত করি।

লাভ কি তাতে? ম্লান হেসে জবাব দিয়েছিলেন রায়পিথৌরা, আজ আর সেখানে আমার কি আছে? ... ... রাজত্ব নেই, থাকলেও আমার কোন কাজে আসত না, আমি অন্ধ। আত্মীয়রা কেউ বেঁচে আছে কিনা জানি না, যদিই বা কেউ থাকে তারা আর আমাকে গ্রহণ করবে না—আমি বিধর্মীর শিবিরে আছি, তাদের অন্ন খেয়েছি।

তাহ'লে আর আপনার স্বাধীনতায় কাজ নেই। হেসে ওঁর হাত ধরে বলেছিলেন ঘুরী, আপনি আমার কাছেই থাকুন। গলগ্রহ হয়ে থাকবেন এমনও ভাববেন না,—আমি আপনাকে সাগ্রহে স্বেচ্ছায় সমাদর করেই রাখছি।

এর পর পৃথ্বীরাজ যেন মুহম্মদ ঘুরীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন, প্রিয়তম বন্ধু হয়ে উঠলেন ওঁর। অধিকাংশ লোকই জানতে পারে নি যে সুলতানের নিত্যসঙ্গী ঐ লোকটিই তাঁর জীবনের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরাজ চৌহান। সেইজন্যেই ইতিহাসেও এ কথাটার উল্লেখ এত বিরল।

এই ভাবেই চলতে চলতে এল আঁদখুইয়ের যুদ্ধ। আর সেই পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে চারিদিকে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। মুহম্মদ ঘুরী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ওদিককার

গোলমাল মিটিয়ে গজনীতে নিজের শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ভারতে এলেন তাঁর পুরনো তুশমন খোকারদের দমন করতে। কিন্তু এইখানে এসেই তিনি ঠেকে গেলেন বিষম রকম। ওঁর অভিযানের খবর পেয়ে খোকাররা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের তুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় নিলে যে তাদের পরাজিত করা তো দূরের কথা, তাদের কাছে পৌঁছনোই শক্ত। মহম্মদ ঘুরীর বাহিনী পার্বত্য যুদ্ধে খুবই নিপুণ—তারা ঐরকম অঞ্চলেরই লোক—তবু তারাও সে পথে যেতে পারল না। একটি মাত্র সংকীর্ণ বন্ধুর পথ, তাতে পাশাপাশি তু'জনের বেশি যেতে পারে না—আর সেইভাবে যাবার চেষ্টা করলেই শত্রুরা একে একে বধ করতে থাকে অতি সহজে। পাহাড়ের ওপর থেকে আগুন ফেলেও পুড়িয়ে মারে ওরা।

ঘুরী মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন।

মন্ত্রণাসভা ডাকা হ'তে লাগল ঘন ঘন কিন্তু কেউই কোন সুবুদ্ধি দিতে পারে না। অবশেষে একদিন প্রায় হতাশ হয়েই কতকটা আপনা-আপনি বলে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী—পিথৌরা, তুমি আমাকে একটা বুদ্ধি দাও। আর তো আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না!

পিথৌরা আজকাল প্রায়ই এঁদের মন্ত্রণাসভাতে এসে বসেন কিন্তু নিঃশব্দেই বসে থাকেন সাধারণত। ওঁর কাছে কেউ কোনদিন মন্ত্রণা চায়ও না—উনিও কখনো নিজে থেকে দেন না। হাজার হোক পরাজিত এবং বন্দী রাজা—অন্তরে অন্তরে এদের হিত-কামনা করবে এটা আশা করা অন্যায়, ঘুরীর লোকেরাও কিছু তা করত না। শুধু এইটুকু জানত যে তিনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। তাই মন্ত্রণাসভায় এসে বসাতে কখনও কেউ আপত্তি করে নি।

আজও সত্যি সত্যিই কিছু সুমন্ত্রণা আশা ক'রে কথাটা বলেন নি মুহম্মদ ঘুরী, হয়তো কোন উত্তরও আশা করেন নি—কিন্তু

পিথৌরা অপ্রত্যাশিত ভাবেই উত্তর দিলেন। বললেন, পথ একটা কিন্তু আছে শাহানশা—সে পথে শত্রু যাবে এমন আশঙ্কা ওদের নেই, তাই সম্ভবত পাহারাও তেমন রাখবে না। সেই পথে যদি হঠাৎ গিয়ে পড়তে পারেন—ওরা প্রস্তুত হবার আগেই তো কাজ হ'তে পারে।

পথ আছে! তাই নাকি! কোথায়? কোথায়? কোন্ দিকে? একসঙ্গে বহু কণ্ঠে প্রশ্ন ওঠে।

বল নি কেন এতদিন পিথৌরা! কোন্ দিকে সে পথ? তুমি দেখাতে পারবে?

বিনা প্রশ্নে বিনা আমন্ত্রণে রাজকার্যে মন্ত্রণা দিতে গেলে বিশেষত আমার যা অবস্থা—আপনারা সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেই জন্যেই চুপ ক'রে ছিলুম। আর পথ দেখানো—? আমার সে অবস্থা তো রাখেন নি আপনারা! একটু হাসলেন পৃথীরাজ।

তা বটে! লজ্জিত মুহম্মদ মাথা নামালেন। অপর সকলেরও কতকটা আশা ভঙ্গ হ'ল। একজন সেনানায়ক তো একটু রুষ্ট হয়েই বললেন, তাহ'লে আর সে কথা তুলেই বা লাভ কি!

তবে সকলে তাঁর মতো নয়। প্রধান উজীর বললেন, না দেখতে পারলেও উনি হয়তো সন্ধান দিতে পারেন—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই দাও পিথৌরা। তাই দাও। ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন মুহম্মদ ঘুরী।

পথ এমন কিছু গুপ্ত পথও নয়। সে পথ আপনাদের চোখের সামনেই পড়ে আছে, মাথাতে ঢোকে নি। এই পাহাড়ের ওদিকে একটু উপত্যকা মতো আছে দেখেছেন বোধ হয়—

কিন্তু সেদিকটা তো একেবারে খাড়া! অসহিষ্ণু সেনানায়ক আবার বলে ওঠেন।

আঃ, তুমি থামো না গিয়াস বেগ! ধমক দেন মুহম্মদ ঘুরী।

হ্যাঁ খাড়া বলেই সেদিকে ওদের অতটা নজর থাকবে না।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি ছোট পাহাড়ী নদী নেমেছে দেখবেন। বর্ষায় তার স্রোত হয় দুর্বার কিন্তু এখন একেবারেই শুক্‌নো। সেই নদীপথে বেয়ে ওঠা হয়তো একেবারে দুঃসাধ্য হবে না। একটি ছোট দল যদি রাতের আঁধারে এগিয়ে উঠতে পারে, ভোরবেলা যদি অতর্কিতে হানা দেয় ওখানে, তাহ'লে ওদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে তাতে এদিক দিয়ে বাকী সৈন্যের উঠে যাওয়াটা সহজ হয়ে উঠবে। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।

পৃথ্বীরাজের কথা শুনে সকলে লাফিয়ে উঠলেন। আশ্চর্য, খাড়া পাহাড় বলে কেউ ভাল ক'রে দেখেও নি ওদিকটা। এখন গোপনে চর পাঠিয়ে দেখা গেল পৃথ্বীরাজের কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ছোট্ট পাহাড়ী নদী, কিন্তু বহুদিনের খর-স্রোত পাহাড় ক্ষইয়ে জল নামবার পথটাকে খানিকটা ঢালু ক'রে দিয়েছে। এবার সকলে পৃথ্বীরাজকে ঘিরে বসলেন। পৃথ্বীরাজ শুধু ঐটুকু তথ্য জুগিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। পাহাড় পর্বত পথঘাট—এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে তাঁর এমন অসাধারণ জ্ঞান তা কে জানত! তিনি অন্ধ হ'লেও আন্দাজে আন্দাজে পাথরে এঁকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কি আছে, কোন্ পথে এদের যেতে হবে, কোথায় কোথায় কি সুবিধা-অসুবিধা।

এর পর খোকারদের জব্দ করা মুহম্মদ ঘুরীর পক্ষে কিছু শক্ত হ'ল না। শত্রুদের নির্মমভাবে দমন ক'রে—সমস্ত পাঞ্জাবকে আবার পদানত ক'রে বিজয়গর্বে নিশ্চিন্ত হয়ে গজনীর পথ ধরলেন মুহম্মদ ঘুরী। এবারও কিন্তু পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইল না। তিনি মুখে আশ্বাস দিয়ে বললেন, আর বেশিদিন তোমাকে ধরে রাখব না পিথৌরা, আমি ওদিককার একটা বন্দোবস্ত ক'রেই তোমাকে নিয়ে আবার এদেশে ফিরব; কাবুল কি কান্দাহারে তোমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরী করিয়ে হিন্দু দাসদাসী আনিয়ে

মনের মতো ক'রে সাজিয়ে দেব তোমার ঘর—তারপর আমিই তোমার ঘরে অতিথি হব এসে। কেমন?

পৃথ্বীরাজ হাসলেন শুধু।

পথে দেরি করতে কখনই অভ্যস্ত নন মুহম্মদ, বিশেষত এবার তো যাওয়া-আসার পথে ঝড়ের মতোই সবাইকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন কিন্তু হঠাৎ দামিয়াকে পৌঁছে কি হ'ল—হুকুম দিলেন, মাসখানেক এখানেই থাকবেন তিনি। সেই ব্যবস্থাই হ'ল। কিছু কিছু লোকজন এগিয়ে গেল, বাহিনীর অর্ধেকটা রইল তাঁর সঙ্গে।

পৃথ্বীরাজ প্রশ্ন করলেন, হঠাৎ বিশ্রামের ইচ্ছা হ'ল কেন শাহানশা?

শরীরটা ভাল নেই পিথৌরা। কাউকে বলো না কথাটা, শরীর খারাপ হয়েছে শুনলেই মৃত্যু আসন্ন ধরে নিয়ে এখনই আমার সেনাপতিদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে লাঠালাঠি বেধে যাবে। আমাদের তাই মরবার আগে শরীর খারাপ হওয়া নিষেধ। জায়গাটা ভাল—এখানে দু'দিন থেকে বিশ্রাম করব, ফুর্তি করব এই কথাই বলেছি সকলকে।

তারপর একটু থেমে বললেন, অবশ্য আমার আর বেশিদিন নেইও—এখন মেহেরবান খোদার দয়াতে কোনমতে গজনী পর্যন্ত পৌঁছে এই গৃহবিবাদটা বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করতে পারলে আর কোন ক্ষোভ থাকে না।

পৃথ্বীরাজ চমকে উঠলেন যেন কথাটা শুনে। যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল তাঁর মুখ: কেন কেন, একথা বলছেন কেন, একটু যেন বেশি ব্যগ্র —বরং বলা চলে ব্যাকুলভাবেই প্রশ্ন করলেন তিনি।

এই ব্যাকুলতা ও বিবর্ণতাকে বন্ধুর স্বাভাবিক উদ্বেগ ও আন্তরিকতা ব'লে চিনতে না পারবার কোন কারণ নেই। মুহম্মদও তা চিনতে পারলেন। তিনি খুশী হয়ে—একটু সস্নেহ কণ্ঠেই বললেন, কেন বলছি তা আমিও ঠিক জানি না বন্ধু। শুধু ভেতরে

ভেতরে যেন এই বিশ্বাসটা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, আর বেশিদিন আমার বাকী নেই এ দুনিয়াতে। এ ধারণার কোনও বাহ্য কারণ আমিই খুঁজে পাচ্ছি না—সামান্য একটু শারীরিক ক্লান্তি ছাড়া। কে জানে, হয়তো বা সেইজন্যেই—

পৃথ্বীরাজ আর কোন কথা কইলেন না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন শুধু।

সেইদিন অপরাহ্নে হঠাৎ মুহম্মদ ঘুরী প্রস্তাব করলেন, চল বন্ধু, একটু বেড়িয়ে আসি।

আবারও একটু যেন চমকে উঠলেন পৃথ্বীরাজ। আবারও একটু অকারণ ব্যগ্রতা দেখা গেল তাঁর কণ্ঠে। কিন্তু মুহম্মদ তা লক্ষ্য করলেন না। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ঐ যে দূরের পাহাড়টা আকাশের কোলে মিশেছে, ঐখানে পাহাড়ের তলায় ঐ যে দেখছ ছোট সরু সবুজের রেখা—সেও (আপেল) গাছ আর আঙুরলতায় জড়াজড়ি—ওখানে আছে চমৎকার ছোট্ট একটি পাহাড়ে ঝরনা। জায়গাটি ভারি ভাল লাগে আমার। আসলে ওর লোভেই এখানে তাঁবু ফেলেছি। একটু একটু ক'রে পাহাড়ের ওধারে যখন সূর্য অস্ত যায়—সন্ধ্যার আঁধার আসে ঘনিয়ে, তখন যেন মনে হয় খোদা ঐখানেই তাঁর বেহেস্তের একটি টুকরো দিয়েছেন খসিয়ে। ওখানে বসলে তখন রাজ্য সিংহাসন, ঐশ্বর্য, জয়-পরাজয় সবকিছু কোন্ আঁধিয়ারে তলিয়ে যায়—শুধু এক অপার্থিব আনন্দে মন যায় ভরে!

নিজের বলবার ঝোঁকে বলে যাচ্ছিলেন মুহম্মদ, এতক্ষণে নজরে পড়ল পৃথ্বীরাজের মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে উঠেছে—

মুহূর্তের মধ্যে অনুশোচনায় ভরে গেল তাঁর মন, পৃথ্বীরাজের হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, মাপ করো ভাই, তুমি যে এসব কিছুই দেখতে পাবে না—অতটা আমার খেয়ালই ছিল না। তুমি থাক, আমি একাই যাই—

না না। পৃথ্বীরাজ গলায় অস্বাভাবিক একটা জোর দেন, তাতে আমার কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। আপনি আসলে কবি সুলতান—যোদ্ধাও নন, দিগ্বিজয়ীও নন। আপনি যদি এইভাবে বর্ণনা দিয়ে যান তাহলেই আমার দেখার কাজ চলবে।

বেশ বেশ, তাহলে তাই চল। খুশী হয়ে বললেন মুহম্মদ, ঐখানে জলের ধারে একটা গাছতলায় বসে কিছু কাব্যচর্চাই করা যাক চল। আমি তোমাকে শোনাই আমাদের দেশের কবিদের রুবাই আর গজল—তুমি শোনাও তোমার দেশের চারণদের রচিত কীর্তিগাথা আর ভজন।

পৃথ্বীরাজ দীর্ঘকাল চোখে কিছু দেখেন না বলে তাঁর কান খুব সজাগ ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি যাত্রা করার একটু পরেই বললেন, সঙ্গে আর কাউকে নিলেন না সুলতান ?

না না, দরকার নেই। আমরা যাচ্ছি কাব্যচর্চা করতে—সেখানে কি অরসিকদের নিয়ে যেতে আছে ? মাইনে করা দেহরক্ষীরা গেলে ওখানকার শান্তিভঙ্গ হবে, খোদা নারাজ হবেন। আর প্রয়োজনই কি ? তোমারও খাপে তলোয়ার আছে, আমার তো আছেই। ঘুরের মুহম্মদ-বিন-সাম আর হিন্দুস্থানের রায়পিথৌরার হাতে তলোয়ার থাকতে দুনিয়ার কোন দুশমন কাছে ঘেঁষবে না।

ওঁরা যখন ঝরনার ধারে আপেল-কুঞ্জে গিয়ে নামলেন ঘোড়া থেকে, তখন সূর্য পাহাড়ের ওপারে ঢলে পড়লেও পিছনের উপত্যকায় আঁধার নামে নি—তা তখনও রৌদ্রোজ্জ্বল। সেদিকে চেয়ে মুগ্ধকণ্ঠে ঘুরী বললেন, এই সব জায়গায় এলে বাকি তামাম দুনিয়ার সবকিছু ঝুট, সবকিছু অর্থহীন মনে হয়। এখানে এলে মনে হয় এমনি জায়গায় মরতে পারলেও সুখ আছে। এখানে যে মরবে সে যত পাপই করুক না কেন তার দোজখে যাবার ভয় নেই—খোদা তাকে ক্ষমা ক'রে নিজের পায়ের তলায় টেনে নেবেনই !

ততক্ষণে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁরা হু'জনেই নিজেদের ঘোড়া হুটো গাছের ডালে বেঁধে ফেলেছেন। মুহম্মদ হাত বাড়িয়ে পৃথ্বীরাজের হাতটা ধরে বললেন, চল পিথৌরা, কোথাও গিয়ে বসি। আমার হাতটা ধর—অচেনা রাস্তা ঠোক্কর খাবে!

কিন্তু পৃথ্বীরাজ নড়লেন না। শান্তকণ্ঠে বললেন, দাঁড়ান শাহানশা, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। বহুদিন ধরেই এমনি নিরিবিলি একটু অবসর খুঁজছিলুম, মা চণ্ডী দয়া ক'রে আজ তা মিলিয়ে দিয়েছেন!

বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন মুহম্মদ, পৃথ্বীরাজের গলার আওয়াজটাও কেমন যেন গোলমেলে ঠেকল! তিনি একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গেই বললেন, ব্যাপার কি রাজা, কী এমন তোমার জরুরী কথা যা বলবার জন্য এত ভনিতা, এত দিন-ক্ষণ দেখা?

শাহানশা, বহুদিন ধরে আপনি আমাকে বলেছেন—যদি কোন প্রার্থনা থাকে আপনার কাছে নিঃসংকোচে জানাতে, আপনি তা নিশ্চয়ই মঞ্জুর করবেন। এমন কি আমার স্বাধীনতা মায়—আজমীঢ়ের সিংহাসন পর্যন্ত—চাইলে দেবেন!

মনে আছে বৈকি পিথৌরা। মুহম্মদ ঘুরীর স্মৃতিশক্তি অত ক্ষীণ নয়। কথা দিয়েছি যা প্রার্থনা করবে—যদি অসাধ্য না হয়—নিশ্চয় মঞ্জুর করব।

কথা এখনও ঠিক আছে?

কথা আমি একবারই দিই পিথৌরা—আর তা ঠিকই থাকে বরাবর। তুমি চাও তো কুতবউদ্দীন আইবককে সরিয়ে দিল্লীর সিংহাসনই তোমাকে ফিরে দিতে পারি।

না শাহানশা—কোন রাজ্যখণ্ড চাইবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করতুম না। আমি তো আপনাকে বলেছি—ভবিষ্যৎ বলতে আমার আর কিছু নেই। আমার এখন আছে শুধু অতীত। আর সেই

অতীতের সূত্র ধরেই একটিমাত্র বাসনা আছে জীবনে—সেটি হ'ল প্রতিশোধ নেওয়ার।

ঠিক বুঝতে পারলেন না মুহম্মদ ঘুরী। একটু বিহ্বল ভাবেই বললেন, প্রতিশোধ? অতীত? কী বলছ পিথৌরা ঠিক বুঝতে পারছি না! ঠিক কী চাও তুমি বল তো? তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও?

না শাহানশা, সে ইচ্ছা থাকলে বহুদিন আগেই করতে পারতুম। সে সুযোগ অনেকবার এসেছে। আপনি স্নেহ করে বিশ্বাস করে আমাকে বহুদিন আগেই অন্তরঙ্গ করে নিয়েছেন, নিজের শোবার ঘরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু সে যে কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা! আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই—আপনি দয়া করে রাজী হোন।

তুমি যুদ্ধ করতে চাও? আমার সঙ্গে! দ্বন্দ্বযুদ্ধ? অকস্মাৎ হা-হা করে হেসে উঠলেন মুহম্মদ ঘুরী, সে হাসি নির্জন নিস্তব্ধ শৈলসানুতে আহত হয়ে প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে বহুদূর পর্যন্ত সেই পার্বত্য উপত্যকায় ছড়িয়ে গেল—নিমেষের মধ্যে। সেই শব্দে একঝাঁক পাখি ভয় পেয়ে পাহাড়ের আশ্রয় ছেড়ে উড়ে পালাল।—কিন্তু তুমি কি জান না পিথৌরা—ওধারে ইরান তাতার থেকে এধারে হিন্দুস্থান পর্যন্ত তলোয়ারের যুদ্ধে আমাকে হারাতে পারে এমন কেউ নেই।

আমার সঙ্গে তো কখনও আপনার সামনাসামনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় নি সুলতান, কাজেই হিন্দুস্থানের কথাটা তোলা আপনার ঠিক হ'ল না। আমাকে হারালে কথাটা আপনার ঠিক হবে!

কিন্তু তুমি তো অন্ধ। তুমি লড়বে কেমন করে?

সেই জন্যই তো এতদিন অপেক্ষা করেছি মুহম্মদ-বিন-সাম। প্রতিদিন একটু নিভৃত অবসর পেলেই একাগ্র সাধনা করেছি, শব্দের উপর নির্ভর করে নির্ভুল হিসাবে শত্রুর হাতের অবস্থান জানবার। অতি কঠিন কাজ—কিন্তু অপেক্ষাও করেছি আমি দীর্ঘকাল। আমি কোন অন্যায় সুযোগ নেব না, অপরকেও নিতে দেব না—এই হ'ল

বীরের যুদ্ধ সুলতান। আমি আপনাকে হত্যা করতেও যেমন চাই না—তেমনি আত্মহত্যা করারও ইচ্ছা নেই আমার। অন্তত প্রতিশোধ নেবার আগে নয়।

তুমি নির্বোধ পিথৌরা। আমি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছি, তোমার অসহায় আহত অবস্থার সুযোগ নিয়েছি—তুমি যদি আমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার শোধ তুলতে, কেউ তোমাকে দোষ দিত না।

আর কেউ না দিক আমি দিতাম। সে কাজ করা তো দূরে থাক, ভাবলেও আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে যেতাম। আপনাদের গজনীর বীরধর্মের ধারণা আর হিন্দুস্থানের বীরধর্মের ধারণা হয়তো এক নয় শাহানশা।

শেষের কথাতে মুহম্মদ ঘুরীর গৌরবর্ণ মুখ রক্তাভ হয়ে উঠল। তিনি কোষ থেকে নিজের তলোয়ার বার করে বললেন, বেশ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর, বার কর তোমার তলোয়ার! কিন্তু এখনও ভেবে দেখ —যুদ্ধটা একটু অসমান হচ্ছে না?

না সুলতান। একটু পরেই বুঝবেন যে সমানে সমানে লড়বার যোগ্যতা অর্জন না ক'রে এ দুঃসাহসিক কাজে নামি নি আমি।

আরম্ভ হ'ল লড়াই। একদিকে মধ্য-এসিয়ার সবচেয়ে বড় যোদ্ধা আর একদিকে এক অন্ধ। কিন্তু কিছু পরেই মুহম্মদ বুঝলেন যে সত্যিই বৃথা অহঙ্কার করেন নি রায়পিথৌরা—তাঁর শিক্ষা ও অভ্যাস প্রায় নিখুঁত। বরং অসুবিধা হ'তে লাগল মুহম্মদ ঘুরীরই। কারণ ওধারে এখনও প্রচুর দিবালোক থাকলেও এখানটায় পাহাড়ের আড়াল ও আপেল বনের শাখাপ্রশাখায় আন্দোলিত আঙুরলতার ছায়া প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কতকটা লজ্জাতেই সে কথাটা বলতে পারলেন না মুহম্মদ ঘুরী। অন্ধের কাছে অন্ধকারের দোহাই দিতে সঙ্কোচে বাধল।

প্রথমটায় কিছু অবহেলাতেই লড়তে শুরু করেছিলেন ঘুরী।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মনোযোগ দিতে হ'ল বাধ্য হয়ে। শেষে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হ'ল তাঁকে। বুঝতে পারলেন যে সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর সামনে—তিনি যদি মারতে না পারেন তো মরতে হবে তাঁকে!

বহুক্ষণ লড়াই চলল। চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে, তার জন্য নয়—কিন্তু কতক্ষণ চালাবেন মুহম্মদ ঘুরী এ লড়াই! এ কেমন মানুষ যে ক্লান্ত হয় না কিছুতেই—হারও মানে না!

প্রতিদিন যে অভ্যাস করেছে—দীর্ঘকাল ধরে, তার সঙ্গে ধৈর্যের পরীক্ষায় জেতা কঠিন। দু'জনেই সমান যোদ্ধা কিন্তু মুহম্মদের এভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় নি অনেক কাল। তাঁর অভ্যাস গেছে মরচে ধরে। অনেকক্ষণ পরে তিনি একটু একটু ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলেন। ক্রমে সে ক্লান্তি যেন তাঁর হাত ও পা দুটোকেই দুর্বল করে তুলল। অথচ পৃথ্বীরাজ নির্বিকার, তাঁর হাত-পা যেন যন্ত্র, মুখেও একটু ক্লান্তি নেই। পরিশ্রমের চিহ্ন আছে শুধু ঘাম, বাঁ হাতে মধ্যে মধ্যে তা মুছে নিচ্ছেন। শেষে বুঝলেন ঘুরী যে এবার সত্যিই তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে—মনে মনে নিজের ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন! মনে পড়ল গজনীর কথা, নিজের আত্মীয়-পরিজনের কথা, বিপুল সাম্রাজ্যের কথা।

মুহূর্তকাল—কিন্তু সেইটুকু অন্যমনস্কতার সুযোগেই পৃথ্বীরাজের তরবারি আমূল বসে গেল মুহম্মদ ঘুরীর বুকে।

মুহম্মদ একটু স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, একটু টললেন, হাত থেকে তলোয়ারটা পড়ে গেল—তারপর তিনিও লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

পিথৌরা—রায়পিথৌরা, তোমার প্রতিশোধ পূর্ণ হয়েছে! হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন মুহম্মদ ঘুরী।

পৃথ্বীরাজও ততক্ষণে তলোয়ার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তিনি এবার হাতড়ে হাতড়ে পাশে এসে বসলেন।

শাহানশা, যদি একটু একা থাকতে পারেন তো আমি শিবিরে গিয়ে হাকিম ডাকি।

না না—অতক্ষণ তর সইবে না আমার। আমার আর সময় বেশি নেই পিথৌরা! এ আল্লার মর্জি—আমি এইটেই কিছুদিন ধরে মনে মনে অনুভব করছিলাম।

আর কি কিছুই বলবার নেই আমাকে?

তুমি যদি পার তো পালাও এই বেলা। আমার লোকজনরা জানতে পারবার আগেই। নইলে বড় নির্যাতন করবে। আর—আর পার তো আমাকে ক্ষমা ক'রো। জানি না খোদার ক্ষমা পাব কিনা!

বলতে বলতেই মুহম্মদ ঘুরীর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে এল। একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল চিরকালের মত।

পিথৌরা অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম সুলতান। তুমিও আমাকে ক্ষমা ক'রো।

ততক্ষণে ওধারের উপত্যকাতেও অন্ধকার নেমেছে। কিন্তু পিথৌরা তা টের পেলেন না। তাঁর চোখে যে চির অন্ধকার।



জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে সোজা ধড়াস করে প্ল্যাটফর্মের উপর একটা আছাড় খেলো বটুকেশ্বর সামন্ত। গড়িয়ে গেল বাজারের ঝাঁকা থেকে পড়ে-যাওয়া একটা ছাঁচিকুমড়োর মতো।

"আহা-হা, মারা গেল বুঝি লোকটা!" চারদিক থেকে হাহাকার উঠল একটা।

বটুক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যথার চাইতে অপমানের জ্বালাতেই গা জ্বলছে বেশি।

সুতরাং কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

গোঁ গোঁ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল—স্টেশন-মাস্টার পথ আটকালেন—"একটু দাঁড়িয়ে যান না দাদা!"

"কেন, হঠাৎ আবার আপনার এই রসালাপ কিসের?"

স্টেশনে-মাস্টার নাক চুলকে বললেন, "ইয়ে—দেখুন দাদা, আমার স্টেশনে নামতে গিয়ে আপনার হাত-পা ছড়ে গেল, তাই

বলছিলাম, একবার অফিস-ঘরে আসুন, একটু আইডিন লাগিয়ে দি! আপনারা স্যার কলকাতার লোক, গিয়ে হয়তো বদনাম গাইবেন—"

বটুক দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "চুপ করুন মশাই! আর ভালমানুষি করতে হবে না। আধ মিনিটও ট্রেন থামে না আপনার স্টেশনে, আপনি আবার স্টেশন-মাস্টার!"

স্টেশনের বাইরে এসে বটুক একবার করুণ চোখে নিজের দিকে তাকাল।

হাঁটুর কাছে ফেঁসে গেছে অমন খাসা শান্তিপুরী ধুতিটা। গিলে-করা পাঞ্জাবিটা এখানে-ওখানে ময়লা হয়ে গেছে। এই পোশাক নিয়ে কখনো জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া যায়!

শ্বশুরেরও যেন আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না! রিটায়ার করে কলকাতা ছেড়ে একেবারে এই ধ্যাধ্যেড়ে ঘোড়াডাঙায় এসে আস্তানা নিয়েছেন।

কিন্তু এসেই যখন পড়া গেছে—তখন কী আর করা যাবে! তা ছাড়া শাশুড়ী খাওয়ান ভালো। পাকা রুইয়ের কালিয়া, কচি পাঁঠার মুড়ো, বাটিভরা ক্ষীর—ইশ! ইশ! ভাবতেও বটুকের জিভে জল এল।

কিন্তু ঘোড়াডাঙা! কোথায় সেই ঘোড়ার ডিমের ঘোড়াডাঙা?

স্টেশনের বাইরে একটা নিমগাছের তলায় তিনখানা গোরুর গাড়ি। বটুককে দেখেই গাড়োয়ানেরা হৈচৈ করে তেড়ে এল।

না, ঠ্যাঙাবার জন্য নয়।

"কোথায় যাবেন বাবু? কোথায়?"

"ঘোড়াডাঙা।"

"আসুন, আমার গাড়িতে আসুন—"

"এ-গাড়িতে আসুন বাবু—তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব।"

আমার গাড়িতে চলুন মশাই।"

কানের কাছে তিন গাড়োয়ান সমানে চিৎকার করতে লাগল। বটুকের প্রায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, প্রাণ যাওয়ার দাখিল!

"এই, কী হচ্ছে সব ? ভদ্রলোককে নিয়ে মশকরা পেয়েছিস ?"

একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটা লোক। ছ-হাতের মত লম্বা, কটকটে কালো গায়ের রঙ—গরুড়ের ঠোঁটের মত নাকটা মুখের উপর যেন আধ হাত আন্দাজ ঝুলে পড়েছে। গায়ে আধময়লা শার্ট—আস্তিন গোটানো। ছোটখাট একটা দৈত্য-বিশেষ!

যেন যাদুমন্ত্রের কাজ হ'ল। বটুককে ছেড়ে তিন পা পিছনে সরে গেল গাড়োয়ানগুলো।

বিরাট লোকটা আবার বিকট গলায় বললে, "দেখছিস নে, কেমন ধোপদুরস্ত কলকাতার বাবু! তোদের ওসব ঝরঝরে গোরুর গাড়িতে চড়তে যাবে কেন র‍্যা ?—লোকটা বটুককে বগলের মধ্যে চেপে ধরল —"আসুন স্যার আমার সঙ্গে।"

"তুমি আবার কে হে বাপু ?"—লোকটার বগলাদাবা থেকে বটুক প্রাণপণে নিজেকে ছাড়তে চেষ্টা করতে লাগল।

"কেউ নয় স্যার।"—অতিকায় লোকটা প্রায় দেড়মাইল চওড়া একখানা হাসি হাসল : "অধীনের নাম পানকেষ্ট পাড়ুই। আপনারই দাসানুদাস !"

"দাসানুদাস !"

"কত পুণ্যি করলে আপনাদের মতো লোক পাওয়া যায়! চলুন স্যার—কোথায় যাবেন ? আমার ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিচ্ছি।"

"ট্যাক্সি! কোথায় ট্যাক্সি ?"

"ঐ যে আমগাছ তলায়, দেখছেন না !"

তা বটে! কিন্তু না বলে দিলে মোটর গাড়ি চেনা মুশকিল, ধূলোয় মলিন বাঁকা-ট্যাড়া একখানা একশো বছরের পুরনো অস্টিন। হুডটা ছিঁড়ে গিয়ে ঝালরের মতো ঝুলছে চারদিকে।

—"ঐটে ?"

—হাঁ স্যার !"—পানকেষ্ট আবার বত্রিশটা দাঁতের ঝলক দেখিয়ে

দিলে ঃ "একটু পুরনো বটে, কিন্তু একদম সাচ্চা জিনিস। আজকালকার সৌখিন গাড়ির মতো ঠুনকো নয়। নাম দিয়েছি, 'দোছুল-দোলা'। একবার চড়েই দেখুন না স্যার—ছু-মিনিটের মধ্যে আমেজে ঘুম এসে যাবে।"

বটুক কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলার আর সুযোগ পেল না। একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল পানকেষ্ট। হাজির করল একেবারে দোছুল-দোলার সামনে। মরচে-পড়া দরজাটা নারকোলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ির ফাঁস খুলে পানকেষ্ট বললে, "উঠুন।"

"উঠুন! কোথায় উঠব ?"—ভেতর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে রইল বটুক।

"ভেতরে উঠবেন স্যার—সীটে গিয়ে বসবেন। আমি কি নইলে হুডের উপর চাপতে বলছি আপনাকে ?"

"সীট কোথায় হে!"—বটুক বারকয়েক খাবি গেল। এটা একটা প্রশ্ন বটে! সীটের উপর গদিটদির বিশেষ বালাই নেই। একরাশ খোঁচা খোঁচা স্প্রিং আর তার সঙ্গে জড়ানো নারকোলের ছিবড়ে। সীট নয়—শরশয্যা!

"ওর ওপরে কেমন করে বসব হে!"

"স্প্রিং-এর কথা বলছেন ? আজ্ঞে ও তো তূলোর মত নরম! একবার বসলেই বুঝতে পারবেন।"

"পাগল পেয়েছ আমাকে!"—বটুক এবারে দাঁত খিঁচোলো, "কেউ কখনো বসতে পারে ওর ওপর ?"

একটা প্রকাণ্ড হ্যাণ্ডেল নিয়ে গাড়ির সামনে ঘটর ঘটর করে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছিল পানকেষ্ট। এবার ব্যাজার মুখ করে এগিয়ে এল।

"আপনার স্যার বড্ড বায়নাক্কা। পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভালো ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। এতে চাপিয়ে কত রাজা-মহারাজকে পার করিয়ে দিলুম, আর আপনি খুঁত ধরছেন!"

ইঞ্জিনের কাছ থেকে একটা ছেঁড়া চট এনে ভাঁজ করে পেতে দিলে পানকেষ্ট ঃ "নিন, বসুন এবার।"

বটুক ভাবছিল, এ-ট্যাক্সির চাইতে গোরুর গাড়িও ছিল ভালো। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ল, ঘোড়াডাঙা অনেকখানি রাস্তা। গোরুর গাড়িতে চাপলে কবে যে গিয়ে পৌঁছুবে ঠিক নেই। একটু কষ্ট করলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যাবে অন্তত।

চটের উপরেই অগত্যা চেপে বসল। বিলক্ষণ লাগছে!

"কই হে আরাম হচ্ছে না তো?"

"হবে স্যার, আস্তে আস্তে"—পানকেষ্ট আবার হাসল ঃ "সময়ে বুঝতে পারবেন।"

ঝরঝরে গাড়িটা এতক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। বিরাট ভূমিকম্পের মতো সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে তার। ড্রাইভারের সীটে লাফিয়ে উঠে বসে পানকেষ্ট হর্ন বাজালো। সে হর্নের শব্দে দু'কান চেপে ধরল বটুক। মাথার উপর থেকে কতকগুলো কাক কা-কা করে উড়ে গেল—দেখা গেল মাঠের ভিতর দিয়ে একপাল গোরু ল্যাজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে।

দোদুল-দোলা রওনা হ'ল।

কিন্তু হাত-কয়েক এগিয়ে গাড়ি প্রায় দু-হাত লাফিয়ে উঠল শূন্যে—তারপরেই ধপাৎ করে পড়ল।

"গেছি, গেছি!"—চেঁচিয়ে উঠল বটুক।

"এখুনি গেলে চলবে কেন স্যার?"—ড্রাইভারের সীট থেকে ফিরে তাকালো পানকেষ্ট—"একেবারে ঘোড়াডাঙা গিয়ে তবে ছুটি।"

"আপনার গেঁটেবাত আছে স্যার?"

"না।"

"হেড়ে বাত?"

"না।"

"মাজার বাত?

"না—না"—বটুক চটে উঠল ঃ কিছু নেই ওসব। ও সবরে ধার ধারি না আমি।"

"থাকলে বড় ভাল হ'ত স্যার।"—পানকেষ্ট যেন ব্যথা পেল।

"মানে?"

পানকেষ্ট আবার বিকট শব্দে হর্ন বাজালো—একটা ধোপার গাধা আচমকা ভয় পেয়ে কোথায় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

"মানে," পানকেষ্ট বললে ঃ "থাকলে সেরে যেত আর কি! এইজন্যেই তো দোদুল-দোলার এত নাম স্যার! কত লোক যে এ-গাড়িতে চড়ে বাত সারাতে আসে!"

"তোমার মুণ্ডু!"—চটে মুখ ভ্যাংচালো বটুক।

পানকেষ্ট আবার হর্নের শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দিলে।

"পথে লোক নেই জন নেই, খামকা অমন করে হর্ন বাজাচ্ছ কেন হে?"

"দোদুল-দোলা যাচ্ছে স্যার, লোককে একটু হুঁশিয়ার তো করে দিতে হয়! ব্রেকটা আবার ভালো নেই কিনা, ঝট করে কেউ সামনে এসে পড়লে আর সামলানো যাবে না।"

"বল কী হে! অবিশ্রাম ঝাঁকুনির অসহ্য যন্ত্রণা এতক্ষণ যদি বা সইছিল, বটুক এবার আঁৎকে উঠল—"মেরে ফেলবে না তো শেষ পর্যন্ত!"

"আজ্ঞে না স্যার, ঘাবড়াবেন না!"—পানকেষ্ট অভয় দিলে ঃ "আজ পাঁচ বছর দোদুল-দোলা চালাচ্ছি, এর মধ্যে কুড়িজনের বেশি সোয়ারি খতম করতে পারি নি। আপনি হয়তো বেঁচেও যেতে পারেন।"

"থামাও থামাও!" বটুক চেঁচিয়ে উঠল ঃ "আমি এখনই নেমে পড়ব।"

"থামাতে চাইলেই তো এ গাড়ি থামবে না স্যার! যখন তেল ফুরুবে, নামতে গেলে সেই তখন।"

"তার মানে! তাহলে ঘোড়াডাঙায় গিয়ে থামবে কী করে?"

পানকেষ্ট বিরক্ত হয়ে বললে, "একটু-আধটু এদিক-ওদিকও হয়ে যেতে পারে।"

"এদিক-ওদিক!"—এবড়োখেবড়ো রাস্তায় মারাত্মক ঝাঁকুনি আর স্প্রিং-এর খোঁচায় যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিকৃত মুখে বটুক বললে, "কতটা এদিক-ওদিক?"

"ঠিক নেই।"—পানকেষ্ট আবার সেই প্রচণ্ড হর্নটা বাজালো: "এখন আমাকে বেশি বকাবেন না মশাই, অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেতে পারে।"

"অ্যাঁঃ!"—বটুক চুপ করল।

বেবি অস্টিন পাগলের মত ছুটছে। ঝড়াং ঝড়াং শব্দে একবার লাফিয়ে উঠছে আর একবার ধপাৎ করে নেমে পড়ছে মাটিতে। বটুক ইষ্টনাম জপ করতে লাগল।

মাথা ঘুরছে, চোখে ঝিম ধরছে। একবার শুধু দুর্বল গলায় বটুক জানতে চাইল: "শেষ পর্যন্ত বাঁচব তো হে পানকেষ্ট?"

"কিছু বলা যায় না স্যার—তবে চেষ্টা করে দেখব—" পানকেষ্টর জবাব এল। ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েই মড়ার মত ঝিম মেরে রইল বটুক।

কতক্ষণ ও-অবস্থায় ছিল ঠিক নেই। হঠাৎ কানে এল পানকেষ্টর চিৎকার: "ঘোড়াডাঙায় এসে গেছে স্যার! এই যে ঘোড়াডাঙা—"

"বটুক ধড়মড় করে নড়ে উঠল। একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

"থামাও, থামাও"—বটুক চেঁচিয়ে উঠল।

"তেল না ফুরুলে থামবে না স্যার!" প্রশান্ত জবাব পানকেষ্টর।

"তাহলে? ঘোড়াডাঙা যে ছাড়িয়ে গেল!"

"তা গেল। কিন্তু সেজন্যে ভাবছেন কেন? মাইল-পাঁচেক আগে

একটা বাঁক আছে, ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনছি। এর মধ্যে তেল ফুরিয়ে যাবে।"

পেছনে পড়ে রইল ঘোড়াডাঙা—গাড়ি মাঠের ভেতর দিয়ে সমানে বনবন করে ছুটছে।

"যদি না ফুরোয় ?"

"আবার স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসব। ফের তেল নেব।"

"তারপর আবার যে ঘোড়াডাঙা পেরিয়ে যাবে !"

"আবার ঘুরিয়ে আনবো।"—পানকেষ্ট জবাব দিল।

"খুনে ! ডাকাত !" বটুক চেঁচিয়ে উঠল।

"খামকা গালাগালি করবেন না স্যার !"—গর্জে উঠল পানকেষ্ট। "তাহলে সোজা ঐ জামগাছে ধাক্কা দিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে দেব—হ্যাঁ ! তখন আমার দোষ দিতে পারবেন না।"

বটুক কাঠ হয়ে বসে রইল।

ঝড়ের বেগে গাড়ি একটা চৌমাথায় পৌছল। তারপর বাঁদিকে খানিকটা ঘুরে আবার ফেলে-আসা পথ ধরল।

"এবার ঘোড়াডাঙায় গিয়ে থামবে তো ?"

"বলা যায় না স্যার। তেল মাপবার যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেছে। গাঁজার নেশায় সকালে কতখানি তেল ঢেলেছি খেয়াল নেই।"

"কী সর্বনাশ !"

"অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন মশাই ? আজ হোক, কাল হোক—ঘোড়াডাঙার সামনে গাড়ি আমার থামবেই, তবে আমার নাম পানকেষ্ট পাড়ুই।"

"আজ হোক, কাল হোক !"—বটুক হাঁ করে রইল।

"পরশুও হতে পারে। তরশু হওয়াও অসম্ভব নয়। কী করে ঠিক মতো বলব স্যার ? আমি তো আর জ্যোতিষী নই !"

বটুক আবার সেই খোঁচা-খাওয়া স্প্রিং-এর সীটে এলিয়ে পড়ল। জামাইষষ্ঠী মাথায় থাক, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয় !

"ঘোড়াডাঙায় গিয়ে আমার কাজ নেই, স্টেশনেই নিয়ে চলো।"

"স্টেশনে গেলেই যে গাড়ি থামবে একথা কী করে বলব মশাই?"

বটুক অজ্ঞানের মতো পড়ে রইল।

"ঘোড়াডাঙা যাচ্ছে,—ঘোড়াডাঙা যাচ্ছে!"—আবার পানকেষ্টর চিৎকার।

"থামছে না যে! এবারেও যে থামছে না!"—বটুক হাহাকার করে উঠল।

"তেল বেশি আছে বোধ হয়।"—পানকেষ্টর জবাব।

কিন্তু আর নয়। এবার এস্পার কি ওস্পার। মাথায় যেন খুন চেপে গেল বটুকের।

—পেরিয়ে যাচ্ছে—পেরিয়ে যাচ্ছে—ঘোড়াডাঙা ছাড়িয়ে যাচ্ছে একটা বন্দুকের গুলীর মতো!

"জয় মা কালী!" চলতি গাড়ি থেকে বটুক ঝাঁপ মারল।

"করেন কী—করেন কী মশাই!"—বলতে না বলতে পানকেষ্টর দোদুল-দোলা দু-মাইল রাস্তা পার হয়ে গেল।

গাঁয়ের ডাক্তার, টিংচার আইডিন আর লোকজন নিয়ে শ্বশুর ধারেই দাঁড়িয়েছিলেন। আশঙ্কা ছিল, শহুরে জামাই বটুক হয়তো ট্যাক্সির লোভ সামলাতে পারবে না।

তাঁরা ছুটে এলেন। ধরাধরি করে রাস্তা থেকে তুললেন বটুককে। ডাক্তার প্রথমেই ডান পা-টা পরীক্ষা করলেন। বললেন, "একটু ভেঙেছে। দিন সাতেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।"

শ্বশুর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: "যাক ভালোয় ভালোয় পৌঁছেছে তাহলে!"

ভালোয় ভালোয় বইকি! লোকের কাঁধে চেপে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন খেতে যেতে যেতে একবার করুণকণ্ঠে বটুক জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু ট্যাক্সি-ভাড়াটা? ট্যাক্সি-ভাড়া নেবে না পানকেষ্ট?"

"নেবে বইকি? যেদিন তেলের হিসেব করে ঘোড়াডাঙার সামনে থামতে পারবে—সেই দিন!"



মাটির পুতুল

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ধোঁয়া ঢাকা অন্ধকার ভেদ করে দিগন্তের পার থেকে একটা বিরাট ড্রাগনের মত উষ্ণ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ট্রেনটা অবশেষে এক সময় থামলো।

ছোট্ট স্টেশন, বলরামপুর।

আরো অনেক ছোটখাটো স্টেশনের মত এখানেও হাওয়া বইছে শনশন করে রাতদিন। স্টেশনের সীমানায় কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া, খোড়া নিম আর শিমুলের গাছ কেউ কোনদিন সখ করে বসিয়ে থাকবে। সেগুলি এখন বেশ বড় হয়েছে। হাওয়ায় লুটোপুটি খেয়ে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ছে।

সহসা যেন একটি স্বপ্নপুরীর ঘুম ভাঙলো। এতক্ষণ এখানে প্রাণের পরিচয় ছিল না। এখন ছুটে এসেছে হরেক রকমের লোকজন।

করগেটের ছাউনির গুমটি ঘর থেকে স্টেশন-মাস্টারবাবু বেরিয়ে এলেন কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে, নিয়মপালন করতে হবে। কে জানে কোন্ শালা বড় সাহেব কোন্ কামরায় বসে সব নোট করছে! হেড অফিসে পৌঁছেই পাঠাবে চার্জসীট। তারপরে

মেজো ছেলের হাত ধরে পথে বসো। স্টেশন-মাস্টার বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছেন, রেল কর্তৃপক্ষের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছেন। কবে লোনের দরখাস্ত করেছেন, আজও তার জবাব নেই। খালি কাজ আর কাজ।

ওদিকে চলে এসেছে চা গরম, ডাব চাই—কচি ডাব, চীনা বাদাম, মুখরুচি চানাচুর নিয়ে ফেরিওলার দল।

যার যা আছে নিয়ে সব ছুটে এসেছে।

এমন কি বলরামপুরেও মাথায় করে কিছু মাটির খেলনা নিয়ে এসেছে একজন। খড়ের ভেতর থেকে দু'-একটি বিচিত্র জন্তু দুটি চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে আছে। পুতুলওলা ক্ষীণ গলায় হাঁকছে 'মাটির পুতুল!'

স্টেশন-মাস্টারের ছেলেমেয়েগুলো খালি গায়ে প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ট্রেন নিশ্চয়ই ওদের মনে কোন রোমাঞ্চ জাগায় না। এতটুকু শিহরণ জাগায় না মনে। তবু ওরা ট্রেন এলেই ছুটে আসে। অনেক সময় কোন দয়াবান্ মানুষ দু'-একটা নয়াপয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ভিখারী গরীব মনে করে।

গাড়ী থেকেই দেখা যায় রেল-সীমানার বাইরে কয়েকটা পাতার ঘর শান্তি ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক হয়ে পাশাপাশি সহাবস্থান করছে। কয়েকটার গায়ে আবার ভারি সুন্দর আলপনা আঁকা।

জীবন-সংগ্রামে বেরিয়ে পড়েছে কয়েকটা মোরগ, ছাগল এবং কুকুর। একই উদ্দেশ্যে ঘুরছে এদিক ওদিক। অন্ন খুঁটে খাবে। কারো সঙ্গে বিবাদ নেই কোন সংঘর্ষ নেই। পারস্পরিক মৈত্রীর চুক্তি আছে ওদের মধ্যে।

পড়ন্ত বেলা। অঘ্রাণের শেষ। আর একটু পরেই চারদিক অন্ধকারে গ্রাস করবে। ধূসর গোধূলী স্টেশনের ওপর একটা বিষণ্ণ ছায়া এনেছে। স্থলে স্থলে গগনে পবনে সেই ছায়া নেমে এসেছে।

একটা বাড়ির জানালার ফাঁকে যে লজ্জাশীলা মেয়েটি দাঁড়িয়ে, ও নিশ্চয়ই স্টেশনের কোন বাবুর নব-বিবাহিত বউ। তার জীবনের আর একটি ট্রেন চলে যাচ্ছে। চোখে তার ফাঁকা চাউনি।

সবাই একটা যেন প্রতীক্ষায় আছে। কি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে! নিঃশব্দে সবাই দাঁড়িয়ে আছে সেই পরম লগ্নের পথ চেয়ে।

ট্রেনের বাঁশী বাজলো।

আমি এসেছি, আমি যাব, আমি যাচ্ছি—কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। ট্রেনের আওয়াজ হাওয়ায় ধাক্কা লেগে ফিরে এসে যেন ব্যঙ্গ করে।

এঁকেবেঁকে অনেক ধোঁয়া আর অনেক শব্দ করে হাঁকতে হাঁকতে সেই বিরাট ট্রেনটা সারা স্টেশনটায় গা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। যেন একটা অজগর শ্রান্ত হয়ে দেহটা ছড়িয়ে দিয়েছে।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় নীল শাড়ি পরা যে মেয়েটি এতক্ষণ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল, গাড়ি থামতেই সে অনেকখানি ঝুঁকে বলল—এই দেখি!

একগাল হেসে বুড়ো পুতুলওলা বলে উঠে—দেখবেন বৈকি মা! আপনাদের জন্যই তো এনেছি। তারপর সেই ধামাটি মাথা থেকে নামিয়ে বুকের কাছে অতি সন্তর্পণে ধরল পুতুলওলা। তার সমস্ত ঐশ্বর্য ঐ খড়ের ভেতর পড়ে আছে। সমস্ত দিনে যদি দুটি-একটি বিক্রী হয় তবেই হাঁড়ি চড়ে, নইলে বড় কষ্ট।

একটা খেলনা হরষে তুলে দেখায় লোকটা অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে—না, না না। ওটা নয়। ঐ যে—

আরো একটু ঝুঁকে শুভ্রা সুন্দর হাতখানি বাড়িয়ে বলে—ঐ যে ঐ সিংহটা।

বুড়ো পুতুলওলার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সিংহটা পছন্দ হয়েছে তা'হলে। অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে এর পেছনে, অনেক দিনের পরিশ্রম।

মাথার সোনার কেশরগুলি চমৎকার মানিয়েছে! টাটকা পাট সংগ্রহ করে ফেলানো কেশর করা হয়েছে। তেমনি চমৎকার লেজ। দাঁতগুলো চকচক করছে।

বুড়োর মুখে তৃপ্তির হাসি। তার শিল্পকর্মের এই তো স্বীকৃতি। মেয়েটা একমনে সিংহটা দেখছে। মেয়েটার সঙ্গী নেমে এসে সিংহটা তুলে নিল। তারপর অনেকক্ষণ ভালো করে দেখে নিয়ে মেয়েটিকে দিল।

মেয়েটি পুতুলটা তুলে নিয়ে একটু দেখে তারপর ফিরিয়ে দিল। পুতুলওলা বোঝে—এরা নেবে না। শুধু দেখছে। এদিকে ট্রেন তো বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, কখন যে সিটি দেবে কে জানে! তাই স্টেশনে এসব ট্রেন থামবে না, সিঙ্‌ন্যাল নেই, তাই দাঁড়িয়ে গেছে

সারা স্টেশনময় ঘুরতে হবে। হাঁকতে হবে—চাই পুতুল। মাটির পুতুল! পুতুল চাই—পুতুল চাই বলে সুর টানতে হবে, তবে যদি একটা বিক্রী হয়। সিংহ না হয়তো হাতি, নয় তো হরিণ। কেউ কি নেবে না একটা পুতুল!

অনেকে আবার এমনিই ভিড় করে এসেছে। কেনবার মত কোন ঐশ্বর্য নেই। তারা ভিক্ষা চায়। কেবল দুটো নয়াপয়সা, মুড়ি খাবে।

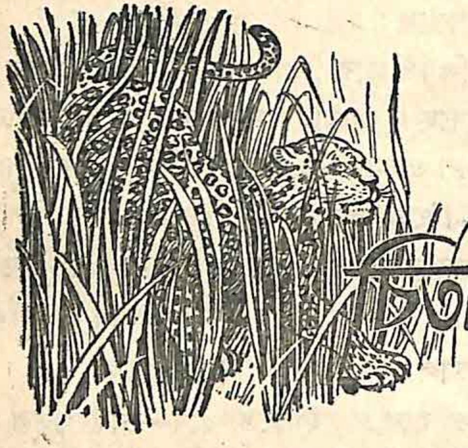
ডাইনিং কারে দরজাটার সামনে তিনটে লোম ওঠা কুকুর জিভ বার করে হাঁফাচ্ছে। পেঁয়াজ সংযুক্ত মাংসের গন্ধ ভেতর থেকে ভেসে আসছে।

বুড়ো হাঁকছে—চাই পুতুল—চাই মাটির পুতুল! ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে সেই মেয়েটি আবার চিৎকার করে ডাকে—পুতুলওলা ও পুতুলওলা!

পুতুলওলা দৌড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু জীবনের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় বৃদ্ধ পরাজিত হ'ল। ট্রেনটা হঠাৎ সিটি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গাড়ী চলে গেল, যেমনটি এসেছিল তেমনি সদর্পে মাটি কাঁপিয়ে—

বৃদ্ধ পড়ে গেছে। তার আর ওঠার শক্তি নেই! অচৈতন্য দেহটা মাটিতে পড়ে আছে।

মাটির পুতুলগুলো প্লাটফর্মময় ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছে।



চিতা নাগেশ্বরী

শক্তিপদ রাজগুরু

কালীপূজোর রাত্রিই হবে সেটা। নীলুর মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। পুরনো জমিদার বংশ। সুতরাং কালীপূজোটা বেশ জাঁক করেই করেন তাঁরা। পাঁঠা যে কত পড়ত সঠিক গুণি নি, তবে বেশ মনে পড়ে, রক্তে হাঁড়িকাঠের চারদিকের মাটি ভিজে যেত, পাঁঠার পর পাঁঠা বলি হয়ে চলেছে।

তারপর ভেড়া এবং শেষে মোষ।

সে এক নারকীয় ব্যাপার। রাতের আবছা অন্ধকারে বন সীমায় ঢাক বাজছে গুরগুর শব্দে। আর ওই উন্মাদ জয়ধ্বনি। ওদিকে রক্তে-ভেজা মাটিতে স্তূপ করা রয়েছে পাঁঠা, মোষ এবং মোষের মুণ্ডু।

শুনেছি, তাঁদের কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির এক পুত্রকে বলা হয়েছিল একটা পাঁঠার মুড়ো নিয়ে যেতে। রাতের অন্ধকারে যোগ্য পুত্ররত্ন বেশ বেছে বেছেই সবচেয়ে বড় মুড়োটাই গামছায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে যায়, এবং সকলের সামনে গামছা খুলতে দেখা যায়, বড় পাঁঠার মুণ্ডু ভেবে যা সে গামছায় বেঁধেছে তা একটি মহিষ শাবকের মুণ্ডু। মহিষের মাথাটাই তুলে এনেছে অন্ধকারে।

কথাটা নিয়ে এখনও অনেকে হাসাহাসি করে।

সেই জমিদার বংশও এখন সাধারণ পর্যায়ে নেমে এসেছে। সেই গ্রামের চারদিকে ঘন শালবন—ওদিকে অজয়ের ধার পর্যন্ত বিস্তৃত গহন অরণ্যভূমি আজ প্রায় উধাও, সেখানে গড়ে উঠেছে বিরাট লোহার কারখানা, হেভি মেসিনারীর কারখানা।

সবই আজ গল্পকথায় পরিণত হয়েছে, তাই আজকের শিকার কাহিনী যা বলব, তাও অতীতের পর্যায়েই পড়েছে, কিন্তু আমি ভুলি নি।

হ্যাঁ, সেই কালীপূজোর রাত্রিতেই সেবার ঘটনাটা ঘটেছিল। গ্রামটা ঠিক ওই মস্ত শালবনের একটু বাইরে, ওদিকে চলে গেছে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—বনের মাঝ দিয়ে, চড়াই, ছোট বড় টিলা আর খাদ—চারদিকে শাল মহুয়া আসান গাছের ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে বনগড়ানী বৃষ্টির জল গিয়ে গিয়ে মস্ত খাদের সৃষ্টি হয়েছে, ওপর থেকে নীচে দৃষ্টি যায় না।

এই বন চলে গেছে অজয়নদী পেরিয়ে বীরভূমের দিকে। ওপাশে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়ার শুশুনিয়া বিহারীনাথ পর্বত-সানু ছুঁয়ে বিহারের দিকে। এক নাগাড়ি জঙ্গল।

রাতের অন্ধকারে ওই শাহী সড়কে ভুলেও লোকজন যায় না। গাড়িও চলে দল বেঁধে, বিশেষ করে ওই জঙ্গলের মধ্যে।

একটা থমথমে অন্ধকার আর বুকচাপা ভয়ে সকলেরই বুক কাঁপে এ বনের মাঝে এসে।

কালীপূজোর পরদিনই ব্রাহ্মণ-ভোজনের সমারোহ। বাইরের বাড়িতে থিয়েটারের মহলা চলছে, একপাশে চুপ করে বসে আছেন নরেনবাবু, সুন্দর টকটকে চেহারা। সাড়ে ছ'ফুট দীর্ঘ—তেমনি সুপুরুষ। এমন বলিষ্ঠ লোক আমি কমই দেখেছি।

মহলায় তাঁর মন নেই। চুপ করে কি যেন ভাবছেন। ওদিকে জঙ্গল মহাল মামড়া থেকে ক'জন লোক আসছে খবরটা নিয়ে।

কয়েকদিন ধরেই একটা বাঘ উৎপাত করছে। আজ এ-গাঁয়ে

—কাল অন্তত মাইল-দশেক দূরে অজয়ের ধারে কোন গ্রামে কাউকে মেরেছে।—আবার দু-তিন দিন কোন খবর নেই। হঠাৎ শোনা যায়, কোশ-চারেক পশ্চিমে আমলাই-এ কোন চাষীকে মেরেছে। একটা আতঙ্কের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘটা ওই অঞ্চলে। তারা অনুনয় করে—'কোন উপায় নেই, ছোটবাবু! কাল রাতে বড় বলদটাকে নিয়ে গেছে।'

নরেনবাবু ইতিপূর্বে যে শিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার কিছুটা পরিচয় আমি জানি। সেই শিকার করতে গিয়ে দু'-একবার অল্পের জন্যে বেঁচে এসেছেন! এখনও মাথায়, বিশাল বাহুমূল্যে সেই গভীর ক্ষতের দাগ মিলায় নি তাঁর।

তবু ঢাকে কাঠি পড়লে গাজনের সন্ন্যাসী নাচবেই, নরেনবাবুও ঠিক থাকতে পারেন না এই খবর শুনে।

'—চল, আজই যাব, বলদটা কোথায় রেখেছে জানিস?'

'—হ্যাঁ। মরা বলদটা বনের মাঝেই নিয়ে গেছে।'

মহলা রইল পড়ে, দলবল তৈরী হয়ে গেল। দেখে মনে হয়, ওদের ওই দল প্রায়ই তৈরী হয়ে থাকে, শুধু নোটীশের অপেক্ষা। আমিও সঙ্গ নিলাম। আমতা আমতা করে বললাম, 'কিন্তু, বাঘ বলে কথা, সেবার হাজারীবাগ জঙ্গলে…'

নরেনবাবু অভয় দেন, 'কোন ভয় নেই। চল তুমি—'

ভরসাই বা কি, জানি না। তবু চললাম ওঁদের সঙ্গে। চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা বস্তু আছে, ওরা ভাববে কি!

সঙ্গে আমরা তিনজন আর নরেনবাবু।

গোটা-তিনেক ব্রিচ লোডার বন্দুক নেওয়া হ'ল আর নরেনবাবু নিলেন একটা ৪৪৪ হেভি রাইফেল। প্রচণ্ড এর শক্তি।

কয়েকটা রাইফেল থেকে বেছে আজ ওইটাই নিয়ে চললেন তিনি।

শাহী সড়ক পার হয়েই আমরা বনে ঢুকলাম। নরেনবাবুকে

লক্ষ্য করে চলেছি। এতক্ষণ নরেনবাবু বেশ হাসিখুশী গল্পবাজ লোক ছিলেন, বনে ঢোকার পর থেকেই কিন্তু কেমন বদলে গেছেন তিনি। পেছনে দল বেধে চলেছি আমরা, মাঝে মাঝে হালকা কথা-বার্তা বলছি—হাসাহাসিও করছি।

তিনি মাঝে মাঝে বিরক্তিভরে চাইছেন আমাদের দিকে, এক সময়ে বলে উঠলেন, 'তোমরা যাকে খুঁজতে বের হয়েছ, সেও যে তোমাদের দেখে নি তা কেউ বলতে পারে! সাবধান, চুপ করে এসো।'

বনে ঢুকলেই তিনি বদলে যান, আগেও তা দেখেছি। হু'চোখে কেমন একটা তীব্র ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে তাঁর, বাতাসে সন্ধান করে চলেন কিসের এক গন্ধের!

বিকেলের রোদ হলুদ-সবুজ শালবনের বুকে হেলে পড়েছে। বাতাসে পাতা আর ফুলের সম্মিলিত একটা মিষ্টি সৌরভ, লাল গেরুয়ামাটি আকাশের দিকে উঠে গেছে, ঘন শালবনের সীমা বুকে নিয়ে। সুন্দর ছবির মত মিষ্টি একটা সোনামাখা রোদ—বিকাল-সুন্দরী যেন কোন বনভূমি। কিন্তু এর বুকেও লুকিয়ে আছে মৃত্যু-দূত। রক্তলোভী কোন পিশাচ।

হঠাৎ গভীর বনের মাঝে এসে থমকে দাঁড়ালেন নরেনবাবু। আকাশে হু'-একটা শকুনি উড়ছে, শ্যেনদৃষ্টিতে তারা সন্ধান করছে কিসের—অরণ্য গভীরে।

ফিসফিস করে লোক হুটো বলে, 'এসে গেছি, বাবু। ওই যে—'

অর্থাৎ বলদের মৃতদেহটা যেখানে বাঘটা রেখে গেছে তার কাছেই এসে পড়েছি। জায়গাটা বেছেচে চমৎকার!

বনভূমি এখানে বেশ গভীর, কয়েকটা পুরনো শালগাছ মাথা তুলেছে, ওপাশে একটা মস্ত অশ্বত্থগাছ ঝাঁকড়া পাতা মেলে ঠাঁইটাকে আঁধার করে রেখেছে। এপাশে ওপাশে ছোট ছোট শালগাছের

ঝোপ। তারই একদিকে মস্ত বলদটা পড়ে আছে। আর সবচেয়ে বিস্মিত হবার কথা, সেটা এমনিই ফেলে যায় নি, শালগাছের ডাল-পাতা ভেঙে তাকে ঢাকা দিয়ে গেছে, যাতে ওই শকুনগুলোর নজরে না পড়ে। বেশ সাবধানী আর চতুর বাঘ।

বালি আর মরা জল-গড়ানি খাতের পাশেই সুন্দর বলদটা পড়ে আছে—চারপাশে থাবার দাগ।

আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি।

বনভূমির গাছপাতায় মর্মরও থেমে গেছে এই নিষ্ঠুর হত্যালীলায়। রক্তের অক্ষরে লেখা কি এক করুণ কাব্য।

নরেনবাবু চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'মাদী বাঘ। আর অন্তত এগার ফুটের কাছাকাছি হবে। পায়ের দাগ থেকে হিসেব করে বাঘের আয়তন পাওয়া যায়।' বললেন, 'গাছের ওপর মাচা কর। আর ওই ঝিলের ওপর দিকে যে শাল-বনটুকু আছে, দু'-চারটে শাল-ডাল কেটে ওটা আর একটু ঝোপ মত কর। এখানের কোন গাছ-পাতায় হাত দেবে না। দূর থেকে পাতা ডাল ভেঙে আন।

মাচা তৈরী করা হ'ল।

প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ—মজবুত পোক্ত ডাল। মাচাটা মন্দ হ'ল না।

নরেনবাবু বললেন, 'বলদের মাথার দিকের ঝোপটায় থাকব আমি, তোরা মাচায় ওঠ।'

নরেনবাবুর ভাইপো দীপুও তরুণ শিকারী, দু'-একটা বিগগেম সেও ঘরে তুলেছে। সে বলে ওঠে, 'মাটিতে থাকবেন?'

'—হ্যাঁ। শয়তান বাঘ ওটা। ভারি চালাক। যে বাঘ লোকালয়ে উৎপাত করে, মানুষ মারে সে স্বভাবতই সাবধানী আর সাহসীই হয়ে ওঠে। মানুষকে সবাই ভয় করে। বনের বাঘ অবধি। তাই এড়িয়ে চলে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বাঘ যদি একবার মানুষ মারে—সে বুঝতে পারে, এর তুল্য সহজ শিকার আর নেই।

হরিণের মত দৌড়তেও পারে না, অন্য কোন জানোয়ারের মত বাধা দিতেও পারে না। সুতরাং সুযোগ পেলেই সে মানুষ মারে—বেপরোয়া হয়ে ওঠে।'

দীপু বলে ওঠে, 'তাই বলছিলাম, রাত্রিবেলা নীচে নাই বা থাকলেন?'

হাসেন নরেনবাবু, 'একটা সুযোগ সে দিয়েছে, বলদটার সবচেয়ে নরম অংশগুলো আগে খাবে। অর্থাৎ লিভার এবং অন্য জায়গাগুলো তার ফলে অসাবধান তাকে হতেই হবে, আর সেই সুযোগ আমি নিতে চাই।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবু তাঁর নির্দেশ মত গাছেই উঠলাম আমরা। তিনি নীচে রইলেন। নিঝুম বনের মাঝে নামছে সন্ধ্যের অন্ধকার। ওদিকে বাতাসে ভেসে ওঠে জাগর অরণ্যের মর্মর-ধ্বনি, গাছে-পাতায় কি যেন কানাকানি চলছে। মুখ বুজে আছে ওরা—নিষ্ঠুর কোন আদিম বনভূমির হিংস্ররূপের প্রকাশে ওরা ভয় পেয়েছে। পাখ-পাখালীর ডাকও থেমে গেছে।

নরেনবাবু বললেন, 'কেউ তোরা গুলি করবি নে।'

মাচার ওপর বসে আছি। দীপু আমাকে বেঁধেছে একটা ডালের সঙ্গে। কথা বলাও বারণ। হাঁচি-কাশি এলে তাও চেপে বসে থাকতে হবে। যেন কোন অন্তঃহীন প্রতীক্ষা!

রাত গভীর হয়ে আসে। আকাশের বুকে তারার আলো দেখা যায়—ক্রমশঃ হেমন্তের প্রথম কুয়াশার ফিকে আভা বনভূমির মাথার আকাশটুকু হালকা আবরণে ঢেকে দেয়। শীত শীত করছে—পাতা ঝরছে বনে। এক একটা পাতা। তাদের মৃদু খসখসানিটুকুও শোনা যায়।

রাতের বনভূমি। দূরে কোথাও একটা শেয়াল ডেকে ওঠে। আবার চুপচাপ—কেউ যেন জোর করে তার কণ্ঠরুদ্ধ করেছে।

মৃত-অন্ধকার বনভূমিতে নেমেছে আতঙ্কের কালো ছায়া, লম্বা

গাছগুলোকে আঁধারে মনে হয় বিশাল কালো দৈত্য। হাত মেলে আকাশ থেকে কোন তারার টিপ-পরা কাজল মেয়েকে ছিনিয়ে আনতে চায় যেন।

বাতাসে বাতাসে একটা চাপা গর্জন-ধ্বনি বন-পাহাড়ীর দিক থেকে বেগে নেমে আসছে কি? অসহ্য রাগ জ্বালায় জ্বলছে সে! কেমন জমাট হয়ে বসে আছি মাচার ওপর। হিমরাতেও তেষ্টা বোধ হয়।

ঘন ঘন শব্দ কানে আসে। ঘন জঙ্গল ভেদ করে একটা আলোর পুঞ্জ ছিটকে বার হয়ে এল। অন্ধকারে ভাটার মত জ্বলছে ছটো চোখ, নীলাভ তীব্র দীপ্তিতে, তারই আলোয় দেখা যায় একটা বিশাল গোল মুখ—আর তার সারা গায়ে ছেকে ধরেছে রাতের জোনাকি পোকা। অসংখ্য জোনাকি। পুঞ্জ পুঞ্জ আলোয় ওর সারা গা ভরিয়ে তুলেছে। বাতাসে জেগে ওঠে বিশ্রী বোটকা গন্ধ।

এতক্ষণে স্তব্ধ আঁধার-ঢাকা অরণ্যানী যেন সজীব হয়ে ওঠে।

আমরা কোথায় হারিয়ে গেছি, বনের আড়ালে ঝোপের মধ্যে। নরেনবাবুও যেন ওই বনভূমির আতঙ্কিত রূপের অতলে হারিয়ে গেলেন।

এগিয়ে আসছে মূর্তিটা। একবার কি ভেবে চারদিকে চাইল, গাছের দিকেও। স্তব্ধ আমরা—নিশ্বাস রুদ্ধ করে বসে আছি।

বাঘটা তারপরই এগিয়ে গিয়ে পেছনের ছটো পা দিয়ে নিমেষের মধ্যে মরা বলদের দেহে ঢাকা দেওয়া ডালপাতাগুলো সরিয়ে ফেলতে থাকে সাঁ-সাঁ শব্দে।

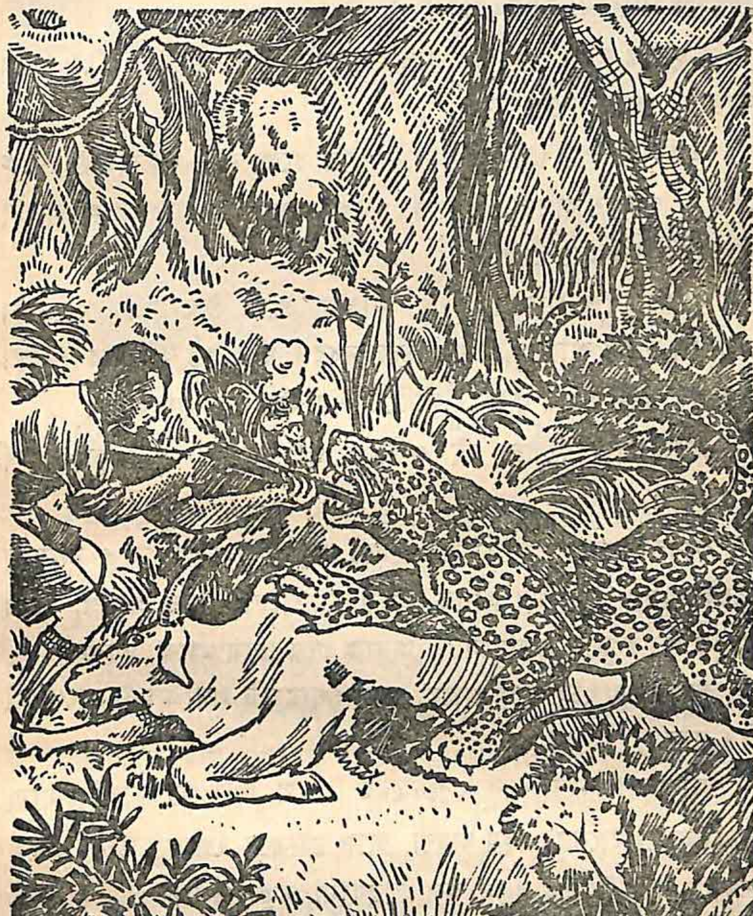
মনে হ'ল, তার সঞ্চিত খাদ্যে কেউ হাত দেয় নি দেখে নিশ্চিন্তই হয়েছে সে। তারপরেই শুরু হয় ভোজনপর্ব।

নরেনবাবুর কথাটা যে কতখানি সত্যি তা বুঝতে পারি। স্তব্ধ দৃষ্টি মেলে কেমন বিভ্রান্তের মত চেয়ে থাকি—আমি যেন কোন অন্য জগতে এসে পৌঁছেছি, হিংস্র আদিম কোন অতীতের জগতে।

বাঘটা বলদের বিশাল বুকের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে,

পাঁজরার নীচে মাথা ঢুকিয়ে পরম তৃপ্তিভরে সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে নিশ্চিন্ত মনে।

হঠাৎ চিৎকার করতে যাব—ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মুখ টিপে ধরলে দীপু। যেন স্বপ্ন দেখছি আমি।



বাঘটার কোনদিকে নজর নেই। মাথাটা ঢোকান রয়েছে মরা বলদটার পেটের মধ্যে। সেখান থেকে একটা চকচক শব্দ উঠছে মাত্র।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন নরেনবাবু—হাতে হেভি রাইফেল। কাছে এসেই ব্যারেলটা দিয়ে ঘাড়ে একট গোঁত্তা দিতেই বাঘটা চকিতের মধ্যে তার রক্তাক্ত ভীষণ মুখখানা বার করে ওর দিকে চেয়ে হাঁ করে ওঠে বাঘটা। তার দু'পাশের দুটো বড় দাত ঝকঝক করছে, দু'চোখে তার অপরিসীম জ্বালা।

মুহূর্তের মধ্যে বাঘের মুখে রাইফেলের ব্যারেলটা গুঁজে দিয়ে ফায়ার করলেন নরেনবাবু।

একটা অস্পষ্ট গর্জন। পুরোটা বার হলো না—অসমাপ্তই থেকে গেল। আহত বাঘটা ছিটকে পড়ল অদূরে।—বারকতক লেজটা আছড়েই স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

নরেনবাবুও গাছের ওপর মাচায় এসে উঠলেন। কয়েকটা জোরাল টর্চের আলো এসে পড়েছে নধর দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাঘটার ওপর। দেখলাম, রক্ত ঝরছে কাঁকুরে মাটিতে—বাঘটা নড়ে না আর।

হেভি রাইফেলের ওই গুলিতে ওর মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

কয়েকটা মশালের আলো এগিয়ে আসে, ওরা দল বেধে আসছে হইচই করে। গ্রামের অনেক লোক। তাদের বনের আতঙ্ক, মনের আতঙ্ক দূর হয়েছে এতদিনে। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তারা।

রক্তাক্ত বাঘটা পড়ে আছে, প্রায় এগার ফুট লম্বা একটা নাগেশ্বরী চিতাবাঘ।

আজ আর নরেনবাবু বেঁচে নেই। যে জায়গায় বাঘটা মারা হয়েছিল, সেখানের গহন অরণ্য আজ হারিয়ে গেছে; তার বদলে সেখানে গড়ে উঠেছে নতুন কল-কারখানা, নতুন জনপদ।

দুর্গাপুর মামড়ার অরণ্যের এই স্মৃতিটুকু আজ কাহিনীতেই পর্যবসিত হয়েছে।



রাজপুত্র আর দুই বন্ধু

রাধারাণী দেবী

এক রাজপুত্র। তার দুই বন্ধু। মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র। তিন বন্ধুতে পরামর্শ করলেন দেশভ্রমণে যাবেন। সঙ্গে বেশি টাকাকড়ি নিলেন না চোর-ডাকাতের ভয়ে। লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিলেন না, দেশ-বিদেশের সব রকমের সকল লোকের সঙ্গে মেলামেশা চেনা-শুনোর বাধা হবে বলে। সাথে রইলো সামান্য টাকাকড়ি আর সাপের মাথার একখানি মহামূল্য মাণিক। দূর দেশে গিয়ে যদি টাকাকড়ির অভাবে দুঃখে-কষ্টে পড়েন, তাহলে এই মাণিকখানি বিক্রি করলে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে, তাতে দেশে ফিরে আসা চলবে। কাউকে কিছু না জানিয়ে সাধারণ পথিকের সাদাসিধে পোশাকে তিন বন্ধু একদিন বেরিয়ে পড়লেন চুপি চুপি দেশ-ভ্রমণের পথে।

সাপের মাথার মাণিকখানি রাজপুত্রের মাথার পাগড়ির তলায় ঘন কোঁকড়া চুলের রাশির নীচে অতি গোপনে লুকিয়ে রাখা হলো

এমন ভাবে যে, পাগড়ি খুললেও সে মাণিক চুলের তলায় কারুর নজরে পড়বে না।

তিন বন্ধু মিলে ক—ত যে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ালেন, তার আর সীমা-সংখ্যা হয় না। কত সমুদ্র—কত পাহাড়—কত নদ-নদী—প্রান্তর পার হয়ে—কত মরুভূমি ডিঙিয়ে তাঁরা দেশে দেশে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোনও দেশ দেখলেন পাহাড়-পর্ব্বতে বনে-জঙ্গলে আঁধার-আব্ছা,—কত সিংহ বাঘ হাতী কুমীর সে দেশের জলে-স্থলে ঘুরে বেড়ায়। মানুষদের চেহারা কোথাও দৈত্যের মতন! কোথাও বা ঘন কালো রঙের পাথরে খোদাই চেহারার মানুষ দেখলেন। আবার কোথাও দেখলেন চাঁদের মতো দেহের বর্ণ, অতি সুন্দর মানুষ। ঝরণা হ্রদ নদ-নদী সবুজ মাঠ আর ফুলে-ফলের বনে সমস্ত দেশখানি যেন ছবির মত আঁকা। কোনও দেশে বা হাজার রং-এর পাখি হাজার স্বরে হাজার সুরে গান গাইছে। কোথাও রৌদ্রোজ্জ্বল উত্তপ্ত মরুভূমির দেশ, কোথাও আবার বরফে ঢাকা হিমের দেশ। মানুষগুলিও যেন সে দেশে তুষার দিয়ে গড়া। তুষারের মত ধব্ধবে তাদের গায়ের রং, ঝাপ্সা নীল আকাশের মতো চোখ, সোনার-বরণ কেশ গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁট।

নানাদেশ ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিন বন্ধু এসে পৌঁছুলেন চম্পাদ্বীপে। চম্পাদ্বীপ নীল সমুদ্রের মধ্যিখানে চাঁপাফুলের বনে ঢাকা ছোট্ট একটি দ্বীপ। সেখানে তিন বন্ধু পথের শ্রমে ক্লান্ত হয়ে রাত্রিবেলায় এক কাঁঠালীচাঁপার ঝোপের তলায় সবুজ ঘাসের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্র নিয়ম করে দিয়েছিলেন, চার প্রহর রাত্রির মধ্যে প্রথম প্রহর তাঁরা তিনজনেই জেগে থাকবেন, দ্বিতীয় প্রহরে রাজপুত্র একলা জেগে পাহারা দেবেন, তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রীপুত্র জেগে পাহারা দেবেন, চতুর্থ প্রহরে কোটালপুত্র জেগে থাকবেন পাহারা দিতে।

এই ব্যবস্থা এ পর্যন্ত সর্বত্র সবদেশে যেমন পালন করা হয়েছে,

চম্পাদ্বীপে এসেও তেমনি হয়েছে। সকালে উঠে কিন্তু রাজপুত্র নিজের চুলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখেন—সর্বনাশ! মাণিক নেই।

সাত রাজার ধন মাণিক—সাপের মাথার মণি—সেই মণি চুরি গেছে! তিন বন্ধু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কি হবে? কি করে তাঁরা এতদূর বিদেশ থেকে নিজেদের দেশে ফিরবেন? সঙ্গে যা টাকাকড়ি ছিল, সমস্তই প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চম্পাদ্বীপে কিছু মাল বিক্রি করে তাঁরা টাকাকড়ি জোগাড় করে আরও খানিকটা দেশ-বিদেশ ঘুরে তারপর নিজেদের রাজ্যে ফিরবেন, ঠিক হয়েছিল। রাজপুত্র বললেন—বন্ধু, মণি বাইরের চোরে চুরি করে নি। আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের কাছে আছে, কারণ চুলের নীচে মণি আছে, এ আমরা ছাড়া আর কারুর জানা নেই। তা ছাড়া সারারাত্রি পাহারায় ত্রুটী হয় নি। কোটালপুত্র আর মন্ত্রীপুত্র নিজের নিজের পোশাক-আসাক খুলে ঝাড়া দিয়ে দেখালেন, মণি তাঁদের সঙ্গে নেই। রাজপুত্রও তখন উঠে নিজের সমস্ত পোশাক আর দেহ ঝেড়ে দেখালেন—তাঁর কাছেও মণি নেই।

মন্ত্রীপুত্র বললেন—চলো এদেশের রাজসভায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে বলিগে, আমাদের মাণিকটা তাঁরা উদ্ধার করে দিন।

রাজপুত্র বললেন—কিন্তু আমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট রেখে মাণিক বার করা চাই। যদি এই গভীর বন্ধুত্বই ভেঙে যায় তুচ্ছ মাণিকের জন্যে, তাহলে সে মাণিক আর আমাদের কোন্ কাজে লাগবে বলো?

কোটালপুত্র বললে—ঠিক, ঠিক বলছো বন্ধু।

তিন বন্ধু মিলে তখনই সে দেশের রাজার সভায় গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে মাণিকটি যাতে পাওয়া যায় অথচ তিন বন্ধুর গভীর বন্ধুত্ব ভালোবাসা একটুও না নষ্ট হয় এই প্রার্থনা জানিয়ে আরজি পেশ করলেন।

সমস্ত ঘটনা শুনে সে দেশের রাজা বললেন—এ অসম্ভব! বন্ধুত্ব

বজায় রাখতে চাইলে মাণিকের আশা ছেড়ে দিতে হবে। আর মাণিক পেতে হলে একজন বন্ধুর বন্ধুত্ব হারাতে হবে।

রাজপুত্র বলে উঠলেন—আমি একটি বন্ধুরও বন্ধুত্ব হারাতে চাই না। তার চেয়ে মাণিক না পাই সেও ভালো। কোটালপুত্র বলে উঠলেন—বাঃ, তা কি হয়! মহামূল্য মণি অমনি হারালে হলো নাকি?

মন্ত্রীপুত্র ধীরে ধীরে বললেন—না মহারাজ! আমরা বন্ধুত্বও হারাতে রাজী নই, মাণিকও হারাতে রাজী নই। আমাদের সেই ব্যবস্থাই আপনি করে দিন।

তখন সেই রাজ্যের বৃদ্ধ মন্ত্রী উঠে বললেন, এ ব্যাপারের মীমাংসা করা অতি কঠিন কাজ। শুনেছি, পৃথিবীর কোন্ দেশে এক রাজ্য আছে,—সেখানে রাজার সিংহাসনে বসেন সে দেশের পরমাসুন্দরী রাজকুমারী, আর সে রাজ্যের শাসন কাজ চালান এক অদ্ভুত জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি শুকপক্ষী। যত কঠিন বিচার আর কঠিন মীমাংসার কাজ হোক না—সেই জ্ঞানী শুক নাকি নিখুঁত নির্ভুল মীমাংসা করতে পারেন।

তিন বন্ধুতে আবার যাত্রা করলেন দেশ-দেশান্তরে। কোন-খানেই খবর পান না, কোন্ রাজ্যের রাজার আসনে বসেন সে দেশের কুমারী রাজকন্যা, আর শাসন কাজ করেন শুকপক্ষী। কেউ কোনো হদিশ দিতে পারে না।

কষ্টে—দুঃখে—পথশ্রমে অনাহারে আধপেটায় তিন বন্ধুর চেহারা শীর্ণ হয়ে গেল, রং হলো মলিন। কাপড়চোপড় ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেল।

একদিন এক প্রান্তরের শেষে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলায় রাত্রি কাটাবার জন্য তাঁরা শুয়েছেন। মাঝের প্রহরে রাজপুত্র জেগে যখন ঘুমন্ত দুই বন্ধুকে পাহারা দিচ্ছেন—সেই সময় গভীর নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন সেই মহাবৃক্ষের

মগডালে এক বিহঙ্গমী কথা কইছে। ব্যাঙ্গমী বলছে—দেখ ব্যাঙ্গমা, কত কষ্টে বাজপক্ষীর সঙ্গে লড়াই করে তুমি আমার বাছাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে এনে দিলে,—কিন্তু আজ পর্যন্ত খাঁটি এক ফোঁটা রাজরক্ত তুমি কিছুতেই জোগাড় করে আনতে পারলে না। বাছা কি আমার তবে চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে থাকবে?

ব্যাঙ্গমা জবাব দিচ্ছে—ব্যাঙ্গমী, খাঁটি রাজরক্ত মেলা সত্যি সত্যি কঠিন। যে রাজার বাপ-পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যথার্থ রাজচক্রবর্তী রাজা ছিলেন,—তাঁরই দেহে থাকে খাঁটি রাজরক্ত। না হলে সংসারে কত মুচি, চোর, ডাকাত, বেণে, মুদী—তারাও বুদ্ধিবলে বা অর্থবলে কোনরকমে রাজ-সিংহাসনে উঠে মাথায় মুকুট চড়িয়ে বসে থাকে। তাদের দেহের শিরায় তো আর রাজরক্ত বয়না! রাজরক্ত বড়ো দুর্লভ সামগ্রী ব্যাঙ্গমী। সত্যিই তোর ছেলের অন্ধ চোখ সারাতে আমি পারবো কিনা সন্দেহ।

রাজপুত্র শুনতে পেয়ে চুপ করে ভাবতে লাগলেন। মনে হলো তাঁর, একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয়, আমার উপরে চতুর্দ্দশ পুরুষ সত্যিই অভিজাত রাজা ছিলেন কিনা!

ভোর না হ'তেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী খাবার খুঁজতে বাসা ছেড়ে উড়ে চলে গেল। রাজপুত্র সেই উঁচু বৃক্ষের মগডালে চড়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসায় পৌঁছুলেন। গিয়ে দেখেন, বাসার মধ্যে মস্ত বড় বড় হীরে মোতি মাণিক রয়েছে। এদের এক একটির দাম হবে লক্ষ লক্ষ সোনার মোহর। সেই সব দামী রত্ন নিয়ে অন্ধ একটি ছোট ব্যাঙ্গমা খেলা করছে একা একা। মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়ে অন্ধ ছানা ব্যাঙ্গমা ভয়ে চিৎকার করে উঠলো—কে?—কে?—কে?

রাজপুত্র তরবারি দিয়ে নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের ডগাটি কেটে ফেললেন। ফিন্‌কি দিয়ে তাজা গরম রক্ত ছুটে ব্যাঙ্গমার ছানার চোখ-মুখ রাঙা করে দিলো। ছানা তার হারানো দৃষ্টি ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখলে, চোখের সামনে এক পরম রূপবান্

যুবা। কিন্তু তার কাপড়চোপড় গরীব লোকের মতন ছেঁড়া আর ময়লা।

ছানা বললে—তুমি কে? নিজের দেহের রক্ত দিয়ে আমার অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে তুমি! শুনেছিলুম, খাঁটি রাজরক্ত না হলে বাজপাখিতে-ঠোকরানো অন্ধ চোখ সারে না কোনদিন। কিন্তু, তোমাকে দেখে তো রাজা-মহারাজা কিংবা রাজপুত্র বলে মনে হচ্ছে না।

রাজপুত্র বললেন—আমি দরিদ্র পথিক। আমার সর্বস্ব খোয়া গেছে। এখন চলেছি সেই দেশের সন্ধানে,—যে দেশে শুকপক্ষী রাজ্য শাসন করে।

ছানা বললে—আচ্ছা। তাহলে তুমি আমার এই খেলনাগুলি নিয়ে যাও। আমি একলাটি বাসায় বসে থাকি বলে বাবা আমাকে এই হীরা মাণিক মুক্তাগুলি এনে দিয়েছেন। এগুলি শুনেছি খুব দামী। বিক্রি করলে তুমি অনেক টাকা পাবে। দুঃখ ঘুচবে।

রাজপুত্র বললেন—উপকার করে তার দান গ্রহণ করতে নেই। তাহলে আমার স্বভাবে বৈশ্যগুণ এসে যাবে। আমি এই দামী রত্নগুলির একটিও নিতে পারবো না। তোমার চোখ যে সেরে গেছে এতেই আমি যথেষ্ট খুশি। আর কিছু দরকার নেই।

এমন সময়ে হুসহুস ডানার আওয়াজ তুলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বাসায় ফিরে এলো বাচ্চার জন্য খাবার নিয়ে।

বাচ্চা আনন্দে চেঁচিয়ে বললো—বাবা—মা, আমি তোমাদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই দরিদ্র পথিকটি এঁর আঙুল কেটে তাজা রক্তে আমার চোখ সারিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাঙ্গমা রাজপুত্রকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে যোড়হাতে বললো —মহারাজ, আপনিই যথার্থ রাজচক্রবর্তী রাজা বটে। তা না হলে এত দয়া, এত মহত্ত্ব, এত বিবেচনা সাধারণ মানুষের কি হতে পারে?

বাচ্চা বাধা দিয়ে বলে উঠলো—বাবা, উনি রাজা বা রাজপুত্র

নন, একজন গরীব পথিক; কিন্তু এই রত্নগুলি উনি নিতে চাইছেন না।

ছানাকে ধমক দিয়ে ব্যাঙ্গমা বললে—চুপ কর্। তুই কী বুঝিস? ছদ্মবেশী রাজপুত্র আর যার চোখেই ধূলা দিন আমায় ভুলোতে পারবেন না। রাজচক্রবর্তী রাজপুত্র না হলে এমন কোন সাধারণ মানুষ নেই, যে আমার এই মহামূল্য হীরা মাণিক মোতি-গুলি নেবো না বলে ফিরিয়ে দিতে পারে। তা ছাড়া যথার্থ রাজরক্ত ভিন্ন অন্ধত্ব কখনও সারতে পারে না।

রাজপুত্র বললেন—তুমি ঠিকই বুঝেছ ভাই! আমি এক দেশের রাজপুত্র। ছদ্মবেশে দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। কাল রাত্রে তোমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে আজ সকালে তোমার ছানাকে রাজরক্ত দিতে এসেছিলুম।

ব্যাঙ্গমা বললে—রাজকুমার! আপনি কোথায় যাবেন, হুকুম করুন। আমি আপনাকে পিঠে করে সেখানে পৌঁছে দেবো।

রাজপুত্র বললেন,—আমি একলাই নই, তিনজন। আমরা যাবো যে দেশে, সে দেশের ঠিকানা আমরা জানি না। যে-দেশে শুকপক্ষীতে রাজ্যের বিচার-কার্য চালায়, সেই দেশে আমি যেতে চাই।

ব্যাঙ্গমা বললে, সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত দেশ-রাজ্য আমার নখের আয়নায় জানা। আমি জানি সেই রাজ্য—যে রাজ্যে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা দেশের রানী, শুকপক্ষী রাজসভায় বিচার করে। রাজকুমার, আপনি আমার পিঠে চড়ে বসুন। আমি সাগরপারে সেই রাজ্যে আজই আপনাকে পৌঁছে দেব।

রাজকুমার বললেন—আমরা যে তিন বন্ধু!

ব্যাঙ্গমা বললে—আচ্ছা, তাহলে আমাদের তিনজনের পিঠে আপনারা তিনজনে চড়ে চলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র আর কোটালপুত্র, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী আর ব্যাঙ্গমার ছানার পিঠে চড়ে চোখ বুজে সমুদ্র পার হলেন মেঘলোকের

উপর দিয়ে। তারপর গিয়ে নামলেন সেই রাজ্যের মাটিতে, যেখানে শুকপক্ষী বিচার করে।

তিন বন্ধু গেলেন সে রাজ্যের রাজার বিচার-সভায়। রাজ-সিংহাসনের উপরে রাজকন্যা প্রতিমা রাজার বেশে বসে আছেন। তাঁর পাশে রত্নের পিঞ্জরে একটি শুকপক্ষী রয়েছে। সেই শুকপক্ষীর চারদিকে পাত্র-মিত্র-সভাসদ্‌রা যে যার স্থানে বসে আছেন। রাজপুত্র বিচার-সভায় গিয়ে চুরির কাহিনী বলে বিচার প্রার্থনা করলেন। বললেন—এমন বিচার করুন, যাতে তিন বন্ধুর বন্ধুত্ব থাকে অথচ মাণিক পাওয়া যায়।

শুকপক্ষী বললেন—এ মামলার বিচার প্রকাশ্য সভায় হবে না। নির্জন ঘরে বিচার করতে হবে।

রাজবেশী রাজকন্যা প্রতিমা তৎক্ষণাৎ নির্জন ঘরে শুকপক্ষীকে রত্ন-খাঁচা সমেত সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে আসার হুকুম দিলেন ভৃত্যদের।

শুকপক্ষী বললে,—প্রথমে শুধু রাজপুত্র একা আসবেন। আমি একা তাঁর সঙ্গে কথা কইবো।

রাজপুত্র নির্জন ঘরে এলে শুকপক্ষী বললে,—রাজকুমার, প্রথমে আপনাকে আমার একটি গল্প শুনে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তারপরে আমি বিচার করবো।

এক দেশে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। তিনি খুব ধর্মবতী। একদিন তিনি নর্মদা নদীতে প্রাতঃস্নান করে বাড়ি ফিরছেন, এমন সময় এক কুষ্ঠরোগী ভিখারী তাঁর পথরোধ করে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে। রাজকন্যা ভিক্ষা দিতে গেলেন, সে বললে—আমি ধন-রত্ন চাই না। আমি যা চাই, তা যদি দিতে পারো, নেবো, না হলে তোমার দান নেবো না।

রাজকন্যা বললেন,—বলো তোমার কী চাই? সাধ্য হলে নিশ্চয় দেবো।

কুষ্ঠরোগী বললে,—আমি তোমাকে বিয়ে করে বৌ পেতে চাই।

রাজকন্যা বললেন,—আমার বাবা আমাকে এক রাজপুত্রের বাগদত্তা বধূ করে রেখেছেন। আমি বাগদত্ত স্বামীর মত না নিয়ে তো তোমায় বিয়ে করতে পারি না।

কুষ্ঠরোগী একটু ভেবে বললে,—আচ্ছা আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য বউ করে পেতে চাই না। তোমাকে খাওয়াতে পরাতে আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। তুমি বরং রাজপুত্রকেই বিয়ে করো। কিন্তু আগে অন্ততঃ একদিন এক রাত্রির মত আমাকে অল্পক্ষণের জন্য বিয়ে করে বউ হয়ে পদসেবা করে যেয়ো।

রাজকন্যা বললেন—আচ্ছা।

তিনি প্রভাতের প্রথম প্রার্থীকে কখনও বিমুখ করতেন না, সে ভিখারীটা তা জানতো, তাই প্রভাতেই প্রার্থনা করেছিল। কিছুদিন বাদে রাজকন্যার সেই বাগদত্ত রাজপুত্রের সঙ্গে খুব ঘটা করে বিয়ে হ'ল। বিয়ের পর রাজপুত্র বাসরঘরে যখন বসেছেন, রাজকন্যা তাঁকে তার প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন। তারপরে বললেন,—তুমি যদি আমায় সেই কুঠে-ভিখারীর কাছে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তার স্ত্রী হয়ে তার পদ-সেবা করে আসতে হুকুম দাও, তবেই আমি তার কাছে যাবো। তুমি যদি হুকুম না দাও তা হলে আমি তার স্ত্রী হয়ে পদ-সেবা করে আসবো না। কিন্তু আমাকে একবার ছেড়ে দিতে হবে, আমি গিয়ে তাকে বলে আসবো সত্য কথা। এই রাত্রে আমাকে সেখানে যেতে হবে।

রাজপুত্র একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন,—তুমি সত্য-বদ্ধ আছ, আমি তোমায় মিথ্যাবাদী করবো না। সে যদি তোমাকে তার পদ-সেবা করতে বলে, করে এসো।

রাজকন্যা সর্বাঙ্গে লক্ষ লক্ষ রত্ন-হীরা, সোণা, মণি-মুক্তা নব-বধূবেশে রাজপথ দিয়ে গভীর রাত্রে সেই ভিখারীর কুটীরের পানে চলেছেন। পথে এক প্রকাণ্ড বাঘ 'হালুম' করে এসে দাঁড়ালো। নধর মানুষের মাংস দেখে তার জিভে জল এলো।

রাজকন্যা হাত জোড় করে বললেন,—বাবা, একটু অপেক্ষা কর, আমি সত্য রক্ষা করে ফিরে এলে তুমি আমার মাংস খেয়ো পেট ভরে। আমি নিশ্চয় ফিরবো।

বাঘ বললে,—আচ্ছা, আমি বসে রইলুম। আবার যেতে যেতে এক চোর সিঁধকাঠি হাতে গভীর নিশীথে নির্জন পথে রাজকন্যার সামনে পড়লো। চোরের চোখ দুটো লোভে জ্বলে উঠলো। ইশ্! কী দামী হীরা-মতি রত্ন এই মেয়েটির সর্বাঙ্গে। এই গয়নাগুলি চুরি করতে পারলে এ জীবনে আর খেটে খেতে হবে না।

রাজকন্যা বললেন,—বাবা, একটু সবুর কর। আমি আমার সত্য রক্ষা করে ফিরে এসে তোমাকে আমার সর্বাঙ্গের সমস্ত রত্ন, অলঙ্কার খুলে দেবো। বিশ্বাস কর।

চোর বললে,—আচ্ছা, এইখানে বসে রইলুম।

কুষ্ঠরোগীর নোংরা ভাঙা কুঁড়েঘরে গিয়ে রাজকন্যা দাঁড়ালেন। বললেন,—আমি এসেছি তোমার পদ-সেবা করতে।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে কুষ্ঠরোগী রাজকন্যার সেই ভুবন-আলো-করা রূপ দেখে চমকে গেল। মা জগদ্ধাত্রী দুর্গা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন মনে ভেবে যোড়হাতে মাতৃস্তব পাঠ করে প্রণাম করলো।

রাজকন্যা বললেন,—তুমি যে বলেছিলে, আমি তোমার পদ-সেবা করলে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ পূর্ণ হবে।

জিভ্ কেটে চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে ভিখারী বললে, —মাগো, কত জন্ম-জন্ম মহাপাপ করে কুষ্ঠরোগী হয়েছি। আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, তাই স্বর্গের মা দুর্গাকে আমি এমন নীচু কথা বলেছিলাম। আমায় ক্ষমা করে তোমার চরণের ধূলো দিয়ে পবিত্র করে যাও মা!

রাজকন্যা ভিখারীকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আবার চললেন

স্বামীর বাসরঘরে রাজপ্রাসাদের পানে। পথে দেখা হলো সেই চোরের সঙ্গে। সে বসে আছে তখনও। রাজকন্যা সর্বাঙ্গের গহনা খুলে বললেন,—এই নাও বাবা, এই রত্ন, অলঙ্কার সমস্ত তোমাকে দিচ্ছি।

চোর পায়ে পড়ে কেঁদে বললে,—মা আমাকে ক্ষমা করে এই পাপ প্রবৃত্তি দূর করে দাও। আমি জীবনে এমন কোনো মানুষ কখনও দেখি নি যে ধনরত্ন চুরির হাত থেকে বাঁচাবার পর আবার ফিরে এসে চোরের মনস্কামনা পূর্ণ করতে নিজের যথা-সর্বস্ব তুলে দেয়। মা, তুমি নিশ্চয় মানবীরূপে কোনও দেবী। আমাকে ক্ষমা কর।

তারপর দেখা হলো সেই ভীষণ বাঘের সঙ্গে।

রাজকন্যা বললেন,—এইবার তুমি আমার মাংস ভোজন করে তৃপ্ত হও বাছা।

বাঘ বললে,—না আমি তোমায় খাবো না। আমি আমার জীবনে কখনো এমন কোনও জীব দেখি নি যে আমার মুখে পড়ে বলে, আমি আবার ফিরে এসে ধরা দেবো ; তখন আমার মাংস খেয়ো। এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি নি যে, তুমি আবার সত্যি আমার মুখে ফিরে আসবে! কিন্তু তুমি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছ বাছা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তোমাকে খেয়ে কি শেষে বদহজমের গোলমালে পড়ে যাবো? তুমি মানবীর রূপ ধরে স্বর্গের দেবীটেবী হবে হয়তো। আমার যখন এতই আশ্চর্য লাগছে, তখন থাক্ তোমার মাংস খেয়ে আর কাজ নেই। আমি চললুম।

বাঘ নিজের পথে চলে গেল। রাজকন্যা ভোর রাত্রে বাসর-ঘরে ফিরে এসে রাজপুত্র স্বামীর পায়ে প্রণাম করলেন।

শুকপক্ষী গল্প বলা শেষ করে বললে,—রাজকুমার বল দেখি,

এই বিয়ের বাসরের রাজপুত্র-বর, ক্ষুধার্ত হিংস্র বাঘ আর ঐ লোভী চোর এই তিনজন রাজকন্যাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল বিশ্বাস করে, এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

রাজপুত্র বললেন,—রাজপুত্র।

শুকপক্ষী বললে,—কেন ?

রাজপুত্র বললেন,—এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হীরা-মুক্তা-মণি-মাণিক্য এমন কিছু জীবনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী নয়, যা চোর ত্যাগ করেছিল। পেটভরে খাওয়াটাও এমন কিছু বড় কথা নয়, জীবনে প্রাণের চেয়েও যখন মানই বড়। সুতরাং বাঘও শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু রাজপুত্র তাঁর জীবনের মান-সম্মান আর শ্রেষ্ঠ আনন্দ রাত্রিকে সত্য পালনের জন্য, ধর্মের জন্য ত্যাগ করে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছেন, এইটেই সকলের চেয়ে বড় মনে হয়। কারণ সত্যের চেয়ে, ধর্মের চেয়ে, ন্যায়বিচারের চেয়ে জগতে বড় আর কিছুই নেই।

শুকপক্ষী বললে,—সাধু! সাধু! রাজপুত্র! তুমি যথার্থ রাজার ছেলের যোগ্য উত্তর দিয়েছ। আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও এবং তোমার বন্ধু মন্ত্রীপুত্রকে এই ঘরে পাঠিয়ে দাও।

মন্ত্রীপুত্র এলেন। শুকপক্ষী তাঁকে বসিয়ে সেই একই গল্পটি সুন্দর করে বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা বাপু, বলো দিকি, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার আর মনের জোর কার ?

মন্ত্রীপুত্র বললেন,—বাঘের।

শুকপক্ষী বললে,—কেন ?

মন্ত্রীপুত্র বললেন,—স্ত্রী বলুন, ধনরত্ন বলুন, এ-সমস্তই গেলে আবার হয়। কিন্তু ক্ষুধার সময় দুষ্প্রাপ্য আহার হাতে পেয়েও ছেড়ে দেওয়া মানে নিজের জীবনকে বিপন্ন করা। তা ছাড়া ক্ষুধা এমন ব্যাপার যে পেটে ক্ষুধানল জ্বললে মানুষেরই জ্ঞানগম্যি থাকে

না, বাঘের মতো জানোয়ারের তো কথাই নেই। সকলের চেয়ে মনের জোর আর ত্যাগ-স্বীকার তাই বাঘেরই।

শুকপক্ষী হেসে বললে,—বুঝেছি। তুমি একটি পেটুক-শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা, এইবার তুমি তোমাদের বন্ধু কোটালপুত্রকে পাঠিয়ে দাও।

কোটালপুত্রকেও সমস্ত গল্পটি বলে শুকপক্ষী তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলে।

কোটালপুত্র বললেন,—সবচেয়ে ত্যাগ-স্বীকার এবং সবচেয়ে মনের জোর চোরের।

শুকপক্ষী হেসে বললে,—কেন?

কোটালপুত্র বললেন,—দেখ, এই সংসার শুধু টাকার বশ। যার যত ধনবল আছে, তার তত শক্তি, তত সুখ, ঐশ্বর্য,—ঐ বিরাট ঐশ্বর্য অগাধ মূল্যের ধনরত্ন নিজের হাতের মধ্যে পেয়েও সামান্য চোর তার লোভ সংবরণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল এটা অত্যন্ত কঠিন জোরের বিষয়। চোরের এই ত্যাগের সঙ্গে রাজপুত্র বা বাঘের ত্যাগের তুলনা হতে পারে না।

শুকপক্ষী বললে,—বাছাধন! সাপের মণিখানি বের করে এই খাঁচার মধ্যে আমার কাছে দাও দিকি। আর বলতে হবে না কে এই মণি চুরি করেছে! আমার কাছে দিয়ে দিলে আমি তোমার আর দুই বন্ধুকে জানাবো না তোমার কাছে পেয়েছি। তাহলে তোমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে কে চুরি করেছিল প্রকাশ পাবে না, মণিও পাওয়া যাবে। মণি যে তোমার দেহের মধ্যেই আছে কোন সন্দেহ নেই।

কোটালপুত্র তখন নিজের বাম উরু চিরে উরুর ভেতর সেলাই করে লুকিয়ে-রাখা মণি বার করে শুকপক্ষীকে দিলেন।

শুকপক্ষী বললে,—আচ্ছা, এইবার তুমি বাইরে যাও, গিয়ে আমার ভৃত্যদের পাঠিয়ে দাও।

রাজকুমারী প্রতিমার আদেশে তখন ভৃত্যেরা রত্নপিঞ্জর আর মাণিকসহ শুকপক্ষীকে এনে আবার রাজসভায় সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

শুকপক্ষী বললে,—এই তোমাদের মাণিক নাও। কার কাছে পাওয়া গেছে বলবো না। তোমাদের বন্ধুত্ব ঠিক বজায় রইলো, মাণিকও মিললো। কেমন? বিচার ঠিক হয়েছে তো?

তিনজনেই সমস্বরে বললে,—হাঁ, ঠিকই হয়েছে।

তখন শুকপক্ষী বললে,—এই রাজ্যের রাজা বা রানী হচ্ছেন এখানকার রাজকন্যা কুমারী প্রতিমা। আমি প্রস্তাব করছি, এই রাজপুত্রের সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ে দেওয়া হোক। রাজকুমারী প্রতিমার স্বর্গগত পিতামাতা বলে গেছেন, তাঁদের কন্যার যেন তাঁরই সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, যাঁর দেহে খাঁটি রাজরক্ত আছে। আমার ধারণা, এই মহান্ চরিত্র রাজকুমারের শরীরে যথার্থ অভিজাত রাজবংশের রক্ত বইছে। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্রমিত্র, আপনারা সকলে বিবেচনা করুন, এই পরম সুন্দর আর পরম মহৎ রাজকুমারের হাতে আমরা আমাদের কুমারী প্রতিমাকে দান করবো কিনা?

সভার সকলে সমস্বরে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তারপর?

তারপর আর কি!—গান-বাজনা—বাজী পোড়ানো—আলোর মালায় সারা রাজ্য সাজানো—মিঠাই—মণ্ডা—লুচি; মিষ্টির পাহাড়-পর্ব্বত—ক্ষীর দই রাবড়ী; সরবৎ-এর নদী-নালা—ফুলের মালা—ফুলের তোড়া—ফুলের তবক—চন্দনের গন্ধে সুরভি সারের মন-মাতানো গন্ধ—রসুনচৌকিতে সানাইয়ে রাগ-রাগিণীর মিষ্টি আলাপ। হীরা, মুক্তা, মণি-রত্নের ছড়াছড়ি। দান-ধ্যান—আদর-আপ্যায়ন।

পরমা সুন্দরী রাজকন্যা প্রতিমাকে নিয়ে রাজপুত্র দুই বন্ধুসহ মা-বাপের কাছে ফিরে এলেন একদিন।



কৌতূহল আজো যায় নি! ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে' জগতে কিছু সত্যি সত্যি আছে কিনা, অনেকের মত আমারও জানতে প্রবল ইচ্ছা জাগে মনে। তাই কোথাও কোন অলৌকিক কিছুর গন্ধ পেলেই, আগে ছুটে যাই। তবে প্রকৃত কথা বলতে কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। বক্তা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রঙ চড়িয়ে, যে-সব কাহিনীকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা বাস্তব ঘটনা বলে, রোমাঞ্চিত দেহ ও বিস্মিত দৃষ্টি শ্রোতাদের সামনে উল্লেখ করে বাহাদুরী নেন, তার সাড়ে পনেরো আনাই দেখেছি, অপরের মুখে শোনা, নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছিটেফোঁটাও তাতে নেই।

আমি ছাড়বার পাত্র নই। সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরি, আচ্ছা এটা কি সত্যি ঘটনা?

নিশ্চয়। একেবারে নির্জ্জলা সত্যি যাকে বলে।

আপনার জীবনে ঘটেছিল? আবার প্রশ্ন করি।

বক্তা একটু থেমে এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেন, মানে হাঁ, আমার নিজের জীবনে না ঘটলেও, আমার শাশুড়ীর কাছে শোনা। তার মামার বাড়ি কানপুর, সেখানে যখন ঘটনাটা ঘটে, তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

কেউ কেউ আবার আমার মুখে অবিশ্বাসের রেখা ফুটে উঠতে দেখে বিরক্ত হয়ে জবাব দেন, নিজের চোখে না দেখলে বুঝি সত্যি হতে নেই ? অবিশ্বাস করতে হয়—এ ধারণা কোথা থেকে জন্মালো আপনার মনে ?—বলে ভ্রূকুঞ্চিত করে আমায় প্রশ্ন করেন। কাল পাইকপাড়া রোডে, একটা বাড়ির বারান্দা ভেঙে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আপনি তা চোখে দেখেন নি বলে ঘটনাটা সত্যি নয়, বলে উড়িয়ে দেবেন ?

তর্ক না করে চুপ করে যাই। মোটকথা, আমার মন ভরে না ওসব যুক্তিতে। একেবারে সোজাসুজি, যার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে ভূতপ্রেত সম্বন্ধে এমন লোকের মুখ থেকেই শুনতে চাই। যাতে অন্ততঃ বুঝতে পারি যে সত্যি ভূতপ্রেত, অশরীরী আত্মা বলে কিছু জগতে আছে এবং মন থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহটা একেবারে মুছে ফেলতে পারি। দু'-চারজন এমন লোকের সাক্ষাৎ যে পাই নি, তা নয়। তবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তার মূলে আছে মানসিক বিকৃতি বা দৃষ্টির বিভ্রম বা আত্মসম্মোহন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় হয়তো আরো অনেক কিছু তার নামকরণ করা যেতে পারে।

যাক গে, ওসব বাজে কথা এখন থাক। যে কথাটা আসলে আমি বলতে চাই, তা হচ্ছে, একদিন কিন্তু হঠাৎ ট্রেনে এক ভদ্র-লোকের মুখে এমন এক কাহিনী শুনেছিলুম যা আমার চিন্তাজগতে সত্যি একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল। কিন্তু সেই এক এবং অদ্বিতীয়। ও ছাড়া তেমন আর কিছু আজো শুনি নি, তাই এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ধারণা এখনো মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারি নি। প্রহেলিকার মধ্যে যেন রয়েছি।

ঘটনাটা এই রকম।

সেবার বোম্বাই যাচ্ছিলুম। নাগপুর থেকে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠলেন কামরায়। ছোট্ট ফার্ষ্ট ক্লাশ সেই কামরায়, আমরা শুধু দু'টি প্রাণী। কথায় কথায় আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক প্রায়

চল্লিশ বছর বাংলাদেশ ছাড়া। একজন বাঙালীকে এভাবে একাকী নিজের কাছে পেয়ে নিমেষে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। বেশ হাসিখুশী মজার মানুষটি। মাথাজোড়া টাক। এককালে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বয়স সত্তর পেরিয়েছেন এই জানুয়ারীতে। না বললে, এখনো মুখচোখ দেখলে মনে হয় পঞ্চান্ন—ছাপ্পান্ন বড়জোর হবে। ভদ্রলোকের একটি বদ্ অভ্যাস মুহুর্মুহু চুরুট খান।

প্রথমে খুচরো মামুলী আলাপ শুরু হলো। যেমন—দেশ, জন্মস্থান, চাকরিবাকরি, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, নেহরু-গভর্ণমেণ্টের কেচ্ছা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ক্রুশ্চেভ, আইসেনহাওয়ার থেকে বাঙালীর কি ছিল আর আজ কি হয়েছে ইত্যাদি। বিলাপ ও সংলাপের পর যখন চুরুটটায় আবার অগ্নিসংযোগ করার জন্যে চুপ করলেন, আমি প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, আপনি যখন এখানে দীর্ঘদিন আছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িঘর, জমিজমা অনেক কিছু করেছেন তখন একটা খবর নিশ্চয় আমাকে বলতে পারবেন।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তিনি সাগ্রহে বলে উঠলেন, বলুন, কি খবর?

আমি বললুম, আচ্ছা, একবার কিছুদিন আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, আপনাদের এই নাগপুরে একটা বাড়িতে ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে—তিনটে লোককে নাকি মেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা কতদূর সত্যি, জানেন কিছু?

ভদ্রলোকের কপালের কয়েকটা রেখা একসঙ্গে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, কই মনে পড়ছে না তো তেমন কিছু! তারপর চুরুটের ধোঁয়া একমুখ ছেড়ে বললেন, কি জানি! নাগপুর তো ছোট জায়গা নয়। হতে পারে অনেক কিছুই, কে আর খবর রাখে বলুন।

আমি বললুম, আচ্ছা, আপনার কি ধারণা ভূত-প্রেত বলে কিছু আছে—আপনি বিশ্বাস করেন?

চুরুটটা মুখ থেকে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক আমার চোখের ওপর

তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুহূর্তকয়েক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, একদিন ছিল যখন একেবারেই বিশ্বাস করতুম না। তবে, একটা ঘটনা আমার জীবনে যা ঘটেছে, তারপর আর, না বলতে সাহস পাই না।

কৌতূহল উগ্র হয়ে উঠলো। বললুম, কি রকম ?

সে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী মশাই, শুনলে আপনিও হয়তো ঠাট্টা করবেন, লোকটার মাথা খারাপ নাকি ? কিন্তু সত্যি আমার জীবনে যা ঘটেছিল, যাকে প্রত্যক্ষ করেছি, কেমন করে 'কিছু নয়' বলে উড়িয়ে দিই, বলুন তো ?

প্রত্যক্ষ করেছেন ?

হাঁ। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়লো। রাত তখন অনেক। বোধ হয় বারোটার কাছাকাছি। গাড়ী ছুটেছে উন্মত্ত বেগে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু জমাট গাঢ় অন্ধকার, আর ছু'পাশে—পাহাড়, বনজঙ্গলের ঠেসাঠেসি। ঠিক মনে নেই, সেদিনটা বোধ হয় অমাবস্যা ছিল।

যাহোক, ভদ্রলোককে চিন্তামগ্ন দেখে বললুম, আপনার জীবনে ঘটেছিল, বলেন কি ?

হাঁ। বলেই তিনি এমন ভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন যেন কথাটা আমার কাছে বলা উচিত হবে কিনা, তাই ভাবছেন আতঙ্কে !

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তাঁর কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম, এই নাগপুরেই কি ঘটেছিল ?

না।—বলেই তিনি যেন ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠলেন। কি একটা মর্ম্মান্তিক কথা যেন হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

চোখ ছুটো আস্তে আস্তে আমার চোখের ওপর রেখে তিনি বললেন, যাছুকর নরপতির নাম শুনেছেন ?

আরে বাপ ! তিনি তো মস্ত বড় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। একবার সরস্বতী পূজোর সময় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে তাঁর খেলা দেখতে গিয়ে-

ছিলুম। ছুটি ছোকরা আমার সামনে অজ্ঞান হয়ে গেল, যখন তিনি একটা মেয়েকে ষ্টেজের ওপর কেটে ছু'ভাগ করে, আবার জুড়ে দিলেন!

ভদ্রলোক বললেন, শেষদিকে নরপতি ভূতের খেলায় খুব নাম করেছিলেন। শুনেছি, বিলেত-আমেরিকায় নাকি বহু লোক তাঁর এই খেলা দেখতে দেখতে অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে সীট থেকে পড়ে গেছে। এমন দিন ছিল না, যেদিন অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয় নি।—বলে সহসা নীরব হয়ে যেন কি ভাবতে লাগলেন। নিঃশব্দ চুরুটটা যে তাঁর আঙুলের ফাঁকে পুড়ছে, সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না।

বোম্বাই মেল্ ছুটছিল। হঠাৎ একটা বড় জংশন ষ্টেশনের মুখে ঢোকবার আগে ঝনঝন করে লাইনে কি একটা শব্দ হতেই তাঁর চমক ভাঙলো। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি শুরু করলেন, এই নরপতি ছিল আমার একেবারে বাল্যবন্ধু, যাকে বলে ল্যাংটো বেলার ইয়ার। গ্রামের পাঠশালে, স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলুম; তারপর কার্যোপলক্ষে ছু'জনের জীবন ছু'পথে বেঁকে গেলেও, অন্ততঃ বছরে একবার ৺বিজয়াদশমীর প্রীতি-আলিঙ্গন জানিয়ে চিঠি দিতে কখনো তার ভুল হতো না। তা যেখানেই থাকুক—বিলেত, আমেরিকা বা কলকাতায়। এত টাকা, এত নামযশ, এত বড়লোক হয়েছিল, কিন্তু তা বলে বাল্যবন্ধুকে কোনদিন ভোলে নি বা কৃপার চোখেও দেখে নি।

একবার নাগপুরে খেলা দেখাতে এসেছিল। গভর্ণমেণ্ট-আতিথ্য গ্রহণ না করে, সোজা আমার বাড়িতে এসে উঠলো। ওঃ, তা নিয়ে শহরে কি চাঞ্চল্য! ওই যা ভুলে গেছি!

হাঁ, যে কথাটা বলছিলুম।—বলে ভদ্রলোক আবার ফিরে এলেন, পূর্ব্বের আলোচনায়। সেবার ৺বিজয়ার পরদিন আপিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো। ট্রাঙ্ককল্ ফ্রম্ বোম্বে।

হ্যাল্লো!—বলে তাড়াতাড়ি ফোনটা কানে তুলতেই উত্তর এলো। জগদীশ তুই? আমি যাছকর নরপতি বলছি।

হাঁ, কি খবর ? হঠাৎ ট্রাঙ্ককল্ যে !

খবর সব ভাল। আর একটু পরেই আমার জাহাজ ছাড়বে বোম্বে থেকে। এবার খেলা দেখাতে যাচ্ছি জাভায়। তাই ৺বিজয়ার প্রীতি-ভালবাসা ও আলিঙ্গন জানাচ্ছি। বলে একটু থেমে কেমন অদ্ভুত কণ্ঠে যেন আবার সে বললে, ভাই, বোধ হয় এই শেষ বিজয়া আমার জীবনে, তাই চিঠিতে না জানিয়ে নিজে মুখে জানিয়ে যাচ্ছি।

কি যা-তা অমঙ্গলের কথা বলছিস—বিদেশযাত্রার আগে! যত বুড়ো হচ্ছিস, তোর যেন ছেলেমান্‌ষি বাড়ছে! বলে মৃদু তিরস্কার করে সেই সঙ্গে আমিও তাকে ৺বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানালুম।

সে বললে, সত্যি বলছি ভাই, এবার মনে কেমন যেন ভয় হচ্ছে। হয়তো আর ফিরবো না! জানিস তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলে শাসিয়েছে।

কারা! চমকে উঠলুম। যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো আমার সামনে!

যাহুকরের গলাটা নিমেষে আর একটু কেঁপে উঠলো। বললে, যে-সব অশরীরী আত্মাদের নিয়ে খেলা দেখাই, তাদের দলপতি। তুই হয়তো ভাবছিস ঠাট্টা করছি, ষ্টেজের ওপর কৃত্রিম সিয়াস্ বসিয়ে কল্পিত ভূত-প্রেত আমদানি করে লোক ঠকিয়ে যে এতদিন খাচ্ছে, আজ তার মুখে এ কি কথা!

হাঁ, আজ সেই কথাটাই তোকে বলে যেতে চাই, যা আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী জানে না। হয়তো আর জানবেও না। বলে সে শুরু করলে, জানিস ইদানীং ভূতের খেলা দেখাতে দেখাতে মনে হতো যেন, সত্যিকারের কতগুলি বিকট ছায়ামূর্তি আমার আশেপাশে ঘুরছে। গ্রাহ্য করি নি। কিন্তু একদিন অন্ধকার ষ্টেজের ওপর থেকে দেখি এক বিকটাকৃতি ছায়ামূর্তি উইংস্-এর পাশে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আতঙ্কে ডাক ছেড়ে চিৎকার

করে উঠলুম। দর্শকরা কিন্তু তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমায় সংবর্ধনা জানালে। সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগল সেদিনের খেলার। আমি একেবারে চুপ। ভেতরে ঠকঠক করে কাঁপছি। কাউকে কিছু বলি নি।

সেদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, কে যেন আমায় বলছে, সাবধান, ভূত-প্রেত নিয়ে রঙ্গরস করে, লোকের সামনে অশরীরী আত্মাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মজা একদিন টের পাইয়ে দেবো। এখনো যদি ভাল চাও তো ও আত্মঘাতী খেলা বন্ধ কর। নইলে তোমার জীবন-সঙ্কট ঘটবে বলে দিচ্ছি।

পরের দিন কিন্তু আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো! ষ্টেজের ওপর ভূয়ো 'মিডিয়ম্' নিয়ে কৃত্রিম 'সিয়াস্' যেমন প্রতিদিন বসাই, সেদিনও তেমনি বসিয়েছি, এমন সময় দেখি আমার সেই মিডিয়ম ছোকরাটি সত্যি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে অথচ তার হাত লিখে চলেছে টেবিলের ওপর সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে সহসা তার হাতটা থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ খুলে চাইলে। আমি তাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি! সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠেছে, এমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু নয় তো! আমি কাগজখানা নিয়ে তখন পকেটে পুরে রাখলুম। নিজের ঘরে এসে দেখি লেখা, সাবধান, আবার বলছি এখনো সাবধান! বন্ধ করে দে এ খেলা! ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

সবে এই কথাটা উচ্চারণ করেছে নরপতি, অমনি যেন কে জোর করে টেলিফোনটা কেটে দিলে। হ্যাল্লো, হ্যাল্লো, বলে অনেক ড্যকাডাকি করেও আর কোন সাড়া পেলুম না।

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক কেমন এক রহস্যভরা দৃষ্টিতে আমার মুখের ওপর তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম, তারানাথ তান্ত্রিক? ও লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্' ছিল। পিশাচসিদ্ধ না হাতী!

যখন জীবিত ছিল একবার আমি বিভূতি বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে গিয়েছিলুম তাকে দেখতে। ওঃ, সে কি এখানে? হাওড়া জেলার কোন এক অজ-পল্লীগ্রামে মার্টিন কোম্পানীর রেল থেকে নেমে ডাহা আড়াই ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বললে বিশ্বাস করবেন না, এত কষ্ট সব জলে গেল। ওখানকার লোকেরা দেখলুম ভয় করে, পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকের নাম উল্লেখ করতে গেলেই আগে দু'হাত যোড় করে কপালে ঠেকায়। আমাদের কিন্তু মনে হলো লোকটা একেবারে বাজে 'বোগাস্'।

'বোগাস্' কথাটা বলা শেষ হয় নি তখনো, অমনি দপ করে গাড়ীর আলোটা নিভে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো, এ কি! আলো নেভালো কে?

আমি হেসে জবাব দিলুম, ক আবার নেভাবে? 'ফিউজ' হয়ে গেল। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামলে গার্ডকে বলে ঠিক করিয়ে নেবো। বলেই আবার ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলুম, হ্যাঁ, তারপর কি হলো?

কি আর হবে! মাস তিনেক আর কোন খবর নেই। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় একটা সংবাদ বেরিয়েছে— "জাভার বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে ভৌতিক ক্রীড়া প্রদর্শনকালে যাদুকর নরপতি অকস্মাৎ ষ্টেজের ওপর থেকে অজ্ঞান হয়ে নীচে পড়ে যান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, খেলা দেখাবার সময় সত্যিকারের প্রেতাত্মা তাঁকে এইভাবে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং একাদিক্রমে দু'মাস ধরে' একই রঙ্গমঞ্চে 'ফুল হাউস' চলে।"

আমি একটু হেসে বললুম, ওকে বলে 'বিজেনেস ষ্টাণ্ট'—ব্যবসা জমাবার ফন্দী। কি চমৎকার ব্যবসাবুদ্ধি দেখেছেন যাদুকরের!

ভদ্রলোক এবার চটে উঠলেন, চুপ করুন মশায়। আগে সব শুনুন, তারপর লাফাবেন। পরদিন তাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমার জীবন তিনি রক্ষা করেছেন!

এর ঠিক পনেরো দিন পরে নরপতির এক চিঠি পেলুম, সেদিন আমার কথা শুনে ঠাট্টা মনে করেছিলি, কিন্তু খুব জোর বেঁচে গেছি। তারানাথ তান্ত্রিক পিশাচসিদ্ধ, সাংঘাতিক শত্রুতা করেছে। জানি না, কপালে কি আছে! হয়তো এই শেষ চিঠি আমার তোকে।

একটু থেমে ভদ্রলোক এবার চুরুটটা জ্বেলে নিলেন। নিভে গিয়েছিল। তারপর বারকতক টান দিয়ে আবার বললেন, এর কিছুদিন পরে, বেশ মনে আছে সে দিনটা ছিল কিসের ছুটি, আপিস আদালত সব বন্ধ। আমি একাই আপিসঘরে বসে কাজ করছি। জরুরী কাজ। পরদিন ইন্‌কাম-ট্যাক্সের হিসাবনিকাশ দাখিল করতে হবে। হঠাৎ দারোয়ান এসে খবর দিলে, এক ছোক্‌রী আব্‌সে ভেট্ করনে মাঙ্গতা।

মুখটা কাগজ থেকে না তুলেই জবাব দিলুম, আজ নেহি হোগা, কাল আনে বলো।

একটু বাদে ঘুরে এসে দারোয়ান আমার হাতে একটা ছোট্ট কাগজের শ্লিপ দিলে, তাতে লেখা—শ্রীলীনা চ্যাটার্জ্জী—ফ্রম্ তারানাথ তান্ত্রিক, পিশাচসিদ্ধ।

আরে, তারানাথ তান্ত্রিক তো মরে ভূত হয়ে গেছে কবে! তার কাছ থেকে আসছে? ব্যাপার কি! কৌতূহল হলো। দারোয়ানকে বললুম তাকে পাঠিয়ে দিতে।

একটু পরেই সেই মেয়েটি এসে ঢুকলো ঘরে। ধবধবে রঙ কিন্তু ফর্সা বলা চলে না, যেন বিবর্ণ। বয়েস চৌদ্দও হতে পারে আবার চব্বিশও অসম্ভব নয়। ক্ষয়া, ঘষা, অপুষ্ট চেহারা, মুখ, চোখ, নাক সবই আছে, অথচ কোনটাই ঠিক ঠিক মত নয়। মাথার চুলগুলো

কটা, অস্বাভাবিক রকমের লাল্চে। কপালে ছ'হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বসলো আমার সামনে, মুখোমুখি টেবিলের ওপরে। বিস্মিত দৃষ্টি দিয়ে তার আপাদমস্তক একবার বুলিয়ে নিয়ে বললুম, আপনার নাম লীনা চ্যাটার্জ্জী ?

মেয়েটি জবাব দিলে, হাঁ। তার গলার স্বরটা মোটেই মেয়েদের মত নরম নয়। কেমন যেন ভারি ভারি মোটা, কর্কশ। বললুম, কি দরকার আমার সঙ্গে ?

মেয়েটি ছোট্ট একটা খামেমোড়া চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, তারানাথ তান্ত্রিক এই চিঠিটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমি বললুম, তিনি তো মারা গেছেন অনেকদিন! এ চিঠি আপনার কাছে কেমন করে এলো ?

মেয়েটি বললে, আমি তাঁর মিডিয়ম্—তাঁর আত্মা আমার দেহটা অধিকার করে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে তাঁর যা বক্তব্য লেখায়। যন্ত্রস্বরূপ আমার হাতটা শুধু তিনি ব্যবহার করেন মাত্র। কি লিখি, কেন লিখি, কিছুই আমি জানি না। স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু আমার হাত কাজ করে যায়।

চিঠিটা হাতে করে আমি বললুম, আচ্ছা, আমার নাম-ঠিকানা এসব তিনি পেলেন কোথায় ?

মেয়েটি অদ্ভুত এক ধরনের হাসি হেসে উঠলো। তিনি পিশাচসিদ্ধ, পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ থাকুক, তার নাম-ঠিকানা জানতে তাঁর কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে মাত্র! আচ্ছা, নমস্কার। বলেই মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে চলে যেতে আমি খামটা ছিঁড়ে চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে চমকে উঠলুম! ছোট্ট চিঠি, মাত্র তিনটি লাইন, পেন্সিলে লেখা : তোমার বন্ধু ভেবেছে কি? জগতের সামনে আমাদের নিয়ে এইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর কত করবে? সেদিন একটা আছাড় মেরেছিলুম। তাতেও শিক্ষা হয় নি! আজ থেকে সাতদিন সময়

দিলুম, যদি এই সব খেলা বন্ধ না করে তা হলে আর আমি ঠেকাতে পারবো না তার মৃত্যুকে। সবাই ক্ষেপে উঠেছে। ইতি—তারানাথ তান্ত্রিক।

ভদ্রলোক এই বলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুহু করে ছুটে চলেছে ট্রেন। বাইরে যেমন অন্ধকার গাড়ীর ভেতরটায় যেন তার চেয়েও বেশি।

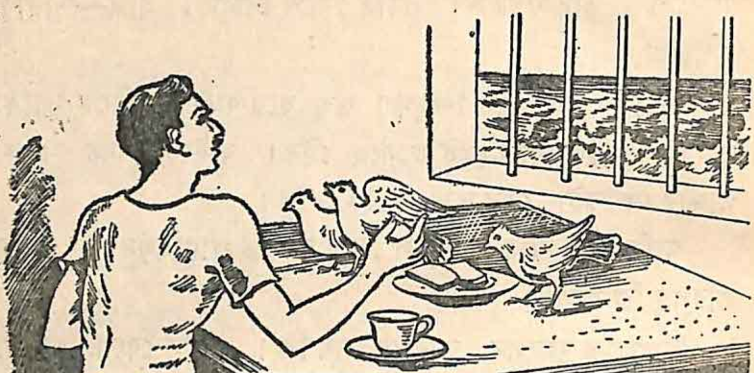
আমি তখন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলুম না। বললুম, তারপর কি হলো?

ভদ্রলোক বললেন, তারপর আর কি! কোন্ দেশে, কোথায় নরপতি খেলা দেখাচ্ছে জানি না, তবু একখানা চিঠি ও একটা তার দিলুম ভৌতিক খেলা দেখাতে নিষেধ করে। জানি না সে চিঠি ওর কাছে পৌঁছেছিল কিনা। কারণ ঠিক তার সাতদিন পরে কাগজে যাদুকর নরপতির মৃত্যুসংবাদ দেখে একেবারে আঁতকে উঠেছিলুম! সংবাদ বেরিয়েছে, ভৌতিক-ক্রীড়া প্রদর্শনকালে অকস্মাৎ হার্টফেল করায় যাদুকরের মৃত্যু হয় ষ্টেজের ওপর।

আমি বললুম, বলেন কি!

ভদ্রলোক বিষণ্নস্বরে বললেন, এর পরেও আপনি বিশ্বাস করতে বলেন অশরীরী আত্মা বলে কিছু নেই, ভুত-প্রেত সব মিথ্যা!

ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছিলুম কিনা জোর করে বলতে পারি না। তবে হাঁ-না কোন উত্তর না দিয়ে ক্ষাণিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে যে তাকিয়েছিলুম, তা বেশ মনে আছে।



দাদুর গল্প বলা

সতীকুমার নাগ

আজ আমি তোমাদের কি গল্প বলবো, বল তো ? দাদু বললেন। নিজের দাড়িতে হাত বুলালেন, আর কি যেন একটু ভাবলেন।—বেশ, আমি তোমাদের আমার এক বন্ধুর কথা বলছি।

কে ? নাতি-নাতনীরা প্রশ্ন করে।

যে আমাকে সব চেয়ে ভালবাসতো ; আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম।

কি তার নাম ? আবার তারা প্রশ্ন করে।

এই তো বলছি, চুপটি করে বস। কেউ কোন কথা বলবে না। চুপ করে শোন। এই বলে দাদু তার গল্প বলা শুরু করেন।

ভোর হয়েছে। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্য উঠেছে, তার লাল আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে পূর্ব-আকাশে সমুদ্রের পারে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়···সমুদ্রের জাহাজের আনাগোনা। ঘরের সামনে গাছ। সব গাছের নামও জানি না। বাইরের সঙ্গে তো আমার কোন যোগাযোগ নেই। ছোট ঘর। নির্জন, নিরালা। আমি এ-ঘরটিতে থাকি। এক, দুই করে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখি। দেখি, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উড়ে

যাচ্ছে এক ঝাঁক পাখি। কোথায়, কত দূর কে জানে? চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাবি, আমারও যদি ডানা থাকতো! তবে, আমিও উড়ে যেতাম···অনেক দূরে আকাশের সঙ্গে মিশে যেতাম। ওরা কত সুখী! সত্যি, ওদের দেখে হিংসে হতো—।

দাদু সকালে কিছু খেতে না? ছোট নাতনীর প্রশ্ন।

হ্যাঁ, সকালে জেলের জেলার খাবার পাঠাতো রুটি, জেলি আর চা। একদিন রুটি খেয়ে বাকী টুকরো রেখে দিয়েছি ছোট টেবিলটির ওপরে, চায়ের কাপে মুখ দিয়েছি, ঠিক এমনি সময়ে একটা পাখি··· গায়ের পালকগুলো সাদা···আমার ঘরে এসে ঢুকলো ছোট জানালাটির ফাঁক দিয়ে। টেবিলের আধ-টুকরো রুটির ভাগটুকু ঠুকরে খেতে লাগলো। আমি ওকে বাধা দিলাম না।

পাখিটার কি নাম দাদু? এবার ছোট নাতি প্রশ্ন করে।

পাখিটার কি নাম জানি নে। আমাদের সাদা পায়রা দেখেছ তো? ঠিক তেমনি দেখতে ঐ পাখিটা। যতটা পারলো, পাখিটা খেলো। খানিকটা টুকরো আবার ঠোঁটে করে নিয়ে গেল। আমি ওকে ডেকে বললাম, তুমি আজ থেকে আমার হলে। আমার বন্ধু, তুমি আবার এসো ঠিক এমনি সময়ে। আমি তোমার জন্য রুটি, জেলি রাখবো।

আমার আমন্ত্রণ সে গ্রহণ করেছিল—সে ঝুঁটি নেড়ে তার সম্মতি জানালো, আবার আসবো, বন্ধু।

বকবক করে উড়ে গেল গাছপালা ছাড়িয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে, কতদূর—কে জানে!

তারপর আমি যতটা পেরেছি, জানালার শিক ফাঁক করে দিয়েছি। সত্যি, আমার খুব আনন্দ হলো বন্ধুকে পেয়ে। ঐ নির্জন কারাকক্ষে শুধু আমি একা। কেউ আমার সঙ্গী-সাথী নেই।

তার পরদিন, আমি ওর জন্যে রুটির ভাল অংশটুক রেখে দিয়েছি। জেলার দয়া করে আমাকে একখানা রুটি বেশি দিতেন।

তোমার বন্ধু আর এলো না ? নাতি-নাতনীরা সবাই প্রশ্ন করে।

সেই তো বলছি।—বলে দাদু একটু থামলেন। আবার শুরু করলেন বলতে—আমার মনে হলো, আমার বন্ধু হয়তো আসবে না। কিন্তু, আমার বন্ধু এলো। তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালাম, এসো আমার বন্ধু !

এবার বন্ধু গলা ফুলিয়ে, শরীর দুলিয়ে, বকবক করে আমাকে প্রীতি জানালো। ঘরে ঢুকেই খেতে শুরু করে দিল। খুব ধীরে ধীরে খুঁটিয়ে খেতে লাগলো। আমি সেই ফাঁকে তাকে আমার মনের কথা বলতে শুরু করলাম—বন্ধু দেখতে পাচ্ছ, আমি কত অসুখী। তুমি তো জানো না, আমি আমার দেশ ছেড়ে কতদূরে আছি একা। আমার বাড়িতে ফুলের বাগান আছে, ফলের বাগান আছে, ফসলের মাঠ আছে। বাগানে কতরকম ফল—আম, জাম, লিচু, কলা, পিচ সব পাকা।

হুম্, বলে সে একটা শব্দ করলে। আমার কথা যেন সে বুঝতে পেরেছে, বলে ঝুঁটি নাড়ালো।

শীত আসে। তখন কুয়াশায় চারদিক ঢাকা, এমন কি গাছপালাও কিছু দেখা যায় না। চারদিকে শুধু কুয়াশার জাল ছড়িয়ে আছে। তখন আমার ভারি অসুবিধে হয়। তখন আর আমার বন্ধু আসে না।

শীত চলে যায়। বসন্ত ঋতু আসে।

এবার আমার বন্ধু শুধু একা আসে না। সঙ্গে করে আরো তিনজনকে আনে। তারা খুব ছোট—কচি। বুঝতে দেরি হয় না, ওই কচি বাচ্চারা আমার বন্ধুর ছেলেমেয়ে।

আমার ভারি আনন্দ হলো ওদের দেখে। উঃ, কতদিন পরে আমার বন্ধু এলো! ওরা আসতেই নির্জন ঘরখানা মুখর হয়ে ওঠে। আমিও যেন প্রাণ ফিরে পাই। আমি যে কি করব না করব, ঠিক করতে পারি না।

রুটির একখানা টুকরো হাতে নিয়েছি। হাত থেকে রুটির

টুকরো ছিনিয়ে নেয়—বাচ্চাদের খেতে দেয়। বাচ্চাগুলোও আমার হাত থেকে রুটির টুকরো কেড়ে খেলো।

ভারি হ্যাংলা তো! নাতি-নাতনীরা বলে উঠলো।

হ্যাঁ, গোটা টুকরোটাই গিলে ফেলে। আমার ভারি ভাল লাগছিল। আবার ওরা চলে গেল। সেই গাছপালা ছাড়িয়ে সমুদ্র পেরিয়ে, যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর আমি তাকিয়ে থাকি—এর পর থেকে দেখেছি, ওদের কারো আর ভয়ডর ছিল না।

একদিন দেখা গেল, ওরা আর আসছে না। কেন? আমি রোজ ভেবে মরি। রুটি ওদের জন্যে রেখে দিই। ওদের আসা-পথের দিকে চেয়ে থাকি। দেখতে দেখতে বেলা ব'য়ে যায়।—আর ওরা আসে না। আমি ভাবি, আমি কি ওদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি! সহসা আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়।—রোজই ভাবি, আজ আসবে।

এমনি করে তিনটি মাস কাটলো।

একদিন বাচ্চা তিনটি এলো। কচি বাচ্চারা এখন বেশ বড় হয়েছে। আগের মতোই ওরা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকলো। সোজা আমার টেবিলের উপর এসে বসলো। ওদের আদর করলাম। বললাম, এতদিন তোরা আসিস নি কেন?

ওরা কিন্তু বেশি কিছু খেলো না। ঘরের আনাচে-কানাচে রুটির টুকরো এখনো ছড়ানো রয়েছে। ওরা ও-সব কিছুই ছুঁলো না। ওরা আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে। কি যেন কথা বলতে চায়। তাইতো—সেই সাদা পালক—যে আমার ঘরে প্রথম দিন অতিথি হয়ে এসেছিল—যাকে আমি বন্ধু বলে ডেকেছিলাম—ওদের মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না!

প্রশ্ন করলাম, তোমাদের মা কোথায়? মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

ওরা—তিনজনই ঝুঁটি নেড়ে আমার কথায় সায় দিল। পরে

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। বেশ স্পষ্ট দেখলাম, ওদের তিনজনের চোখ কেমন সজল।

আবার প্রশ্ন করলাম, মা'র কি অসুখ হয়েছিল? এবার তিনজনে একসঙ্গে ঝুঁটি নেড়ে আমায় বুঝিয়ে দিলে, হ্যাঁ, মার অসুখ হয়েছিল।

বুঝতে দেরি হলো না, ওদের মা মারা গিয়েছে। তাই কেউ ওরা আসে নি। মা'র পরিচয় নিয়েই ওরা আমার কাছে এসেছে। ওরা জানতো, আমি ওদের মাকে ভালবাসতাম। ওদের মা-ও ওদের কাছে আমার কথা বলেছে। আজ আমার বেশ মনে পড়ে, কতদিন আমি ওদের মায়ের সঙ্গে কত কথা বলেছি। আমারও চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে। আমার মনে হলো, এ যেন আমারই আত্মীয়-বিয়োগ-বেদনা। আমি ওদের সহানুভূতি জানালাম। আমি বললাম, তোমাদের মায়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। রোজ আসতো ঠিক এমনি সময়। —ওরা ওদের মায়ের কথা আগ্রহভরে শুনলো। আমি বললাম, তোমরা রোজ এমনি সময়ে আসবে কিন্তু! ওরা চলে গেল সেদিন।

এই নির্জন বন্দীঘরে বছরের পর বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে নিজের দেশে কি ঘটেছে না ঘটেছে, কিছুই জানি নি।

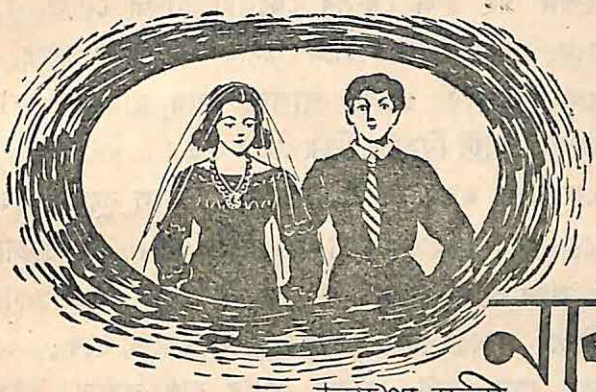
তারপর একদিন আমার বন্দীঘরের দরজা খুলে গেল। সকাল বেলা। দু'জন সার্জেন্ট এলো আমার ঘরে। ঘোষণা করলো আমায় ডেকে, মিস্টার লীডার, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে। এই দেখ···হ্যাঁ, আজই এ কালাপানির দেশ থেকে তোমাকে তোমার দেশে যেতে হবে। তৈরী হয়ে নাও—জাহাজ ঘাটে ভিড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে ফেলি। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, আমার বন্ধুর কথা—বন্ধুর ছেলেমেয়েদের কথা।

সেদিন আমি আর ওদের দেখতে পেলাম না। হয়তো আমার ঘরে নতুন মানুষ দেখে ওরা ফিরে গিয়েছে।

ফিরে এলাম আমার দেশে, আমার বাড়িতে।

তারপর?—এখানেই শেষ হলো দাদুর গল্প বলা।



নাক

আশা দেবী

অনেকদিন আগে প্রাগ-এ এক বুড়ো কৃষক বাস করত। তার একটি ভারি সুন্দরী মেয়ে ছিল। এত সুন্দরী আর এমন গুণের যে, আশপাশের অনেক ছেলে তাকে বিয়ে করবার জন্য প্রায়ই বুড়ো কৃষকের বাড়িতে আসত। বুড়ো কিন্তু তাদের সকলকেই পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দিত।

ছেলেরা যখন তারপরও নিয়মিত প্রস্তাব নিয়ে আসতে লাগল, তখন বুড়ো তাদের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ ক'রে দিল। এমন কি বাড়িতে পর্যন্ত তাদেরকে ঢুকতে দিত না। ছেলেরাও তখন সবাই মিলে পরামর্শ ক'রে ঠিক করল—তারা চাকর সেজে বুড়োর বাড়িতে ঢুকবে।

কিন্তু বুড়োর চোখে ধূলো দেবে? বুড়ো তাদেরকে ঠিকই চিনে ফেলত এবং ছেলেদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে ঠিক করল —ছোকরাগুলিকে জব্দ করতে হবে।

ভেবে-চিন্তে বুড়ো একটা বুদ্ধি বার করল। ঠিক করল —এর পর তার বাড়িতে যে-ই চাকর হয়ে আসুক, তাকে সব রকম কাজ করতে হবে এবং এক বছর পর বসন্তকালে কোকিল ডাকলেই কাজ ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর যদি মনিব বা

চাকর ঐ সময়ের মধ্যে কেউ কারুর উপর অসন্তুষ্ট হয়, তবে যে অসন্তুষ্ট হবে, অন্যে তার নাকের ডগাটা কেটে নেবে।

ফলে, তখন এই হ'ল যে-সব ছেলেরা চাকর সেজে কাজ করতে আসত, বুড়ো তাদের সঙ্গে এমনি দুর্ব্যবহার করত যে তারা রেগেমেগে চাকরি ছেড়ে পালাত আর যাওয়ার আগে তাদেরকে নাকের ডগাটা বিসর্জন দিয়ে যেতে হ'ত।

শেষে কোরাণ্ডা নামে একটি বেপরোয়া ছেলে বুড়ো চাষার মেয়েকে বিয়ে করবার মতলবে চাকর সেজে এল। বুড়ো তাকে বলল, বেশ, কাজ করো কিন্তু সর্ত জানো তো? বসন্তকালে যখন কোকিল ডাকবে তখনই কিন্তু চলে যেতে হবে; আর এই কাজের সময় কেউ কারুর ওপর রাগ করতে পারবে না। যদি কেউ করে? তবে যে রাগ করবে অন্যে তার নাকের ডগাটি কুচ করে কেটে নেবে।

কোরাণ্ডা ছেলেটি সব শুনেও কিন্তু বুড়োর এই শর্তে রাজী হ'ল এবং কাজে লেগে গেল। কিন্তু বুড়ো কৃষক এমন সাংঘাতিক ধরনের লোক ছিল যে, এই সব চাকরদের যত রকমে পারত নির্যাতন করত। না সকালে, না দুপুরে, না রাতে কখনই তাকে খেতে দিত না। কিন্তু প্রতিদিনই তাকে রসিকতা ক'রে জিজ্ঞেস করত—কী হে, খুশী আছ তো?

খুশী না থাকলেই নাকের ডগা কাটা যাবে, কাজেই প্রত্যেক বার কোরাণ্ডা হাসিমুখে জবাব দিত—বেশ আছি, কর্তা! তাই বলে তো আর সে ক্ষিদেয় মরতে পারে না! কাজেই ফাঁক পেলেই রান্নাঘরে ঢুকে ভালো মাংস-রুটি যা পেত খেয়ে নিত। তার এই কাণ্ড দেখে চাষার গিন্নী ভারি চটে গিয়ে একদিন কর্তার কাছে নালিশ করে দিল।

কর্তা রেগে আগুন হয়ে কোরাণ্ডার কাছে কৈফিয়ৎ চাইল। কোরাণ্ডা বলল, বা রে, সারাদিন খেটেখুটে বুঝি আমার ক্ষিদে

পায় না? বেশ তো, তা কর্ত্তা যদি আমার ওপর রাগ করে থাকেন তাহলে বরং আপনার নাকের ডগাটা কেটে দিন, আমিও এখান থেকে বিদেয় হই।

এখন কর্তার নাকের ডগা খোয়াবার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কাজেই ব্যাজার মুখেও তাকে একগাল হেসে বলতে হ'ল—না—না, আমি আদৌ চটি নি। তুমি বেশ করেছ।

কিন্তু তারপর থেকে তারা আর কখনও কোরাণ্ডাকে খাবার দিতে ভুলত না।

একদিন এক রবিবারে বুড়ো তার স্ত্রী ও মেয়েটাকে নিয়ে গির্জায় রওনা হ'ল। যাবার আগে কোরাণ্ডাকে বলল—আমরা ফিরে আসবার আগে ভাল করে স্যুপ্ তৈরী করে রেখো। মাংস রইল, পেঁয়াজ রইল, গাজর রইল আর ওতে গুগলিও ছেড়ে দিও।

কোরাণ্ডা হুকুম মাফিক সব করল। মাংস, গাজর, পেঁয়াজ, সব একসঙ্গে মিশিয়ে ঝোল চাপিয়ে দিল আর সে সময় তার চোখে পড়ল কর্তার সখের ছোট্ট কুকুরটাকে যাকে সবাই আদর ক'রে গুগলি বলে ডাকে।

কোরাণ্ডা আসল গুগলির বদলে তাকেই বেশ ক'রে কেটে কুটে স্যুপের মধ্যে দিয়ে দিল।

গির্জা থেকে ফিরে এসে বুড়ো কৃষক তো স্যুপ খেতে বসল। খেতে অত্যন্ত খারাপ লাগছিল কিন্তু বিরক্ত হবার তো জো নেই, তাহলে নাক কাটা যাবে সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই হাসি হাসি মুখে খানিকটা জোর ক'রে গিলে বাকিটা কুকুরকে খাওয়াবার জন্যে সে "গুগলি"—"গুগলি" বলে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু কোথায় গুগলি! সে তো ততক্ষণ বুড়োর পেটের ভিতর। বুড়ো কুকুরটাকে খুঁজতে বার হ'ল। কোথাও না পেয়ে তার মনে

যেন কেমন সন্দেহ হ'ল। তারপর কোরাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করল—এই হতভাগা, গুগলি কুকুরটা কোথায় রে?

কেন? আপনিই তো স্থপে গুগলি দিতে বলেছিলেন। আমি আপনার হুকুম মাফিক তাকে স্থপে দিয়ে দিয়েছি—কোরাণ্ডা ভাল মানুষের মতন জবাব দিল।

রাগে দুঃখে বুড়োর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু গুগলি বললে তো শুধু জলের গুগলিই বোঝায় না, বাড়ির কুকুরটাও বোঝাতে পারে! ওদিকে কোরাণ্ডার উপর চটবারও জো নেই, তাহলেই নাক যাবে। বেকায়দায় পড়ে বুড়োকে কিল খেয়ে কিল মানে, কুকুর খেয়ে কুকুর হজম করতে হ'ল।

ক'দিন পরে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে চাষা শহরে গেল কিছু কেনা-কাটা করতে। যাবার আগে কোরাণ্ডাকে বলে গেল—ঘরটরগুলো একটু খুলে রেখো, যেন খানিক আলো-হাওয়া ঢোকে।

ওদেরও বেরিয়ে যাওয়া আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে কোরাণ্ডা একটা মই লাগিয়ে বাড়ির চালে গিয়ে উঠল। আর বুড়োর শোবার ঘরের চাল থেকে টালিগুলি টেনে নিচে ফেলে দিল। মাথার উপরে খোলা আকাশ হাঁ-হাঁ করতে লাগল। আলো-হাওয়ার একেবারে ঢালাও বন্দোবস্ত!

ফিরে এসে বাড়ির অবস্থা দেখে বুড়োর মাথায় বাজ পড়ল। ক্ষেপে চিৎকার করে উঠল—এ কি কাণ্ড!

আজ্ঞে, আপনি ঘরে আলো-হাওয়া ঢোকার কথা বলেছিলেন, তারই তো ব্যবস্থা করে রেখেছি। কী কর্তা, আমার ওপর অসন্তুষ্ট হলেন বুঝি?

না না, আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে—বলে বুড়ো জ্বলতে জ্বলতে কোরাণ্ডার সামনে থেকে সরে গেল।

কিন্তু কোরাণ্ডাকে নিয়ে তো আর পারা যায় না! এমন একটা শয়তান চাকর আর কিছুদিন থাকলে তো ভিটেমাটি পর্যন্ত উচ্ছন্নে

দেবে। কিন্তু এক বছর না হলে, কোকিল না ডাকলে, তাড়ানই বা যায় কী করে! তাহলে যে সঙ্গে সঙ্গে নাকটিও যাবে।

বুড়ো তার গিন্নী আর মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েটি বলল—বাবা, কাল বিকেলে ওকে নিয়ে বাগানে বেড়াতে যেও। আমি আগে থেকে একটা গাছে উঠে বসে থাকব আর কোকিলের মতন কুহু-কুহু করে ডাকতে থাকব। তা হলেই তো ওর চাকরির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে আর আমরাও ওর হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

ফন্দিটা বুড়োর ভাল লাগল। পরদিন বিকেলে সে কোরাণ্ডাকে বলল—চল হে একটু বাগান থেকে বেড়িয়ে আসা যাক। কী সুন্দর বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে আজ!

কনকনে শীতের কাল, এমন সময় বসন্তের বাতাস! কোরাণ্ডা বুঝতে পারল বুড়োর একটা মতলব আছে। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সে বাগানে গেল।

আর বাগানে পা দিতে না দিতেই গাছ থেকে ডাক উঠল—কুহু—কুহু—কুহু!

দারুণ খুশী হয়ে বুড়ো বলল—ওহে ছোকরা, বসন্তের কোকিল ডাকছে, এবার তুমি সরে পড়।

কোকিলের ডাক শুনেই চালাক কোরাণ্ডা ব্যাপারটা সব বুঝতে পেরেছিল। সে বলল—আহা, কোকিল ডাকছে নাকি? বড় সুখের কথা। আমি কখনও কোকিল দেখি নি, পাখিটাকে তো একবার দেখতে হবে!

বলেই সে এগিয়ে গেল গাছটার কাছে। তারপর গাছটা ধরে গোটা কতক বিষম ঝাঁকুনি! আর যাবে কোথায়, বুড়োর মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে কাটা কুমড়োর মতন ধপাৎ ক'রে মাটিতে পড়ে গেল।

তাই দেখে বুড়ো ভাবল, তার মেয়েটা বুঝি মরেই গেছে! আসলে মেয়েটির বিশেষ লাগে নি, ভয়েতেই সে ভিরমি খেয়ে

গিয়েছিল। বুড়ো রাগে দুঃখে চিৎকার করতে লাগল—বেরো হতচ্ছাড়া, এখুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা—দূর হ—

কোরাণ্ডা ভালোমানুষের মতন বলল—আপনি তাহলে আমার ওপর চটে গেছেন, হুজুর! খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

নিশ্চয়ই, অসন্তুষ্ট হয়েছি—ভীষণ চটেছি!

তাই নাকি? তাহলে এবার প্রতিজ্ঞা পালন করুন। বলেই কোরাণ্ডা পকেট থেকে একটা ছুরি ফস্ ক'রে বের ক'রে বলল—আসুন, আপনার নাকের ডগাটা কুচ ক'রে কেটে নি-ই।

বুড়োর ততক্ষণে আক্কেল ফিরে এসেছে। সে হাঁ-হাঁ করে উঠল।

না না! আমার নাকটা আমি আস্তই রাখতে চাই। তোমাকে বরং আমি নাকের বদলে দশটা ভেড়া দিচ্ছি।

না, আমার নাক চাই।

দশটা গরু!

উহুঁ—নাক!

বুড়ো মাটিতে বসে পড়ল। আর মেয়েটি সামলে উঠে বাবার মাথায় হাওয়া করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বুড়ো বলল—তুমি কি কিছুতেই আমায় ছাড়বে না?

এইবার কোরাণ্ডা বলল—ছাড়তে পারি, যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন!

কী আর করা? নাকের চাইতে তো আর মেয়ে বড় নয়! দায়ে পড়ে বুড়োকে রাজী হতে হ'ল।

খুব ধুমধাম করে তো বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কোরাণ্ডার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে বুড়োর কি খুব দুঃখ হয়েছিল? না, একেবারেই নয়।

কোরাণ্ডা যেমন চালাক তেমনি কাজের ছেলে আর তেমনি সুন্দর তার ব্যবহার। কিছুদিনের মধ্যেই তার চেষ্টায় বুড়োর

খামারের অনেক বেশি উন্নতি হ'ল ; সে বুড়োর নয়নের মণি হয়ে উঠল।

আর বুড়ো অহঙ্কার করে বলতো—আমার কোরাণ্ডার মতো এত ভাল ছেলে দেশে আর একটিও নেই। এমন জামাই লোকে তপস্যা করেও পায় না!

আর কী হ'ল ? কোরাণ্ডার ছেলেপুলেরা দুষ্টামি করলেই তাদের মা তাদের ভয় দেখিয়ে বলত—নাকের ডগা কেটে দেব কিন্তু! তাই বলে কি আর তাদের কারুর নাকের ডগা সত্যিই কাটা গিয়েছিল ?

পাগল!

তাই কখনও যায় ?



কুঁড়ের বাদশা

স্বপনবুড়ো

পরীর দেশে সাড়া পড়ে গেছে

পরীর রানী আদেশ করেছেন—পরীদের রাজ্যে কেউ কুঁড়ে থাকতে পারবে না।

তাতে কারো কিছু অবশ্যি আপত্তি নেই, কেননা পরীরা কখনও চুপচাপ থাকতে চায় না, পারেও না!

হালকা পাখায় ভর দিয়ে উড়ে উড়ে—তারা কাজ করতেই ভালবাসে। পরীরাজ্যে তোমরা যদি কখন যাও—অবশ্যি ঘুমের ঘোরে, তাহলে দেখতে পাবে—পরীর দল গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে সমস্তক্ষণ ব্যস্ত রয়েছে কাজে, ঠিক যেন এক ঝাঁক মৌমাছি।

পরীর রানীর আদেশে সবাই আরো খুশী হয়ে উঠলো।

কিন্তু গোল বাধলো কুঁড়েরামকে নিয়ে। পরীর দেশে সবাই তার নাম রেখেছিল কুঁড়ের বাদশা।

যখন রানীর আদেশ তার কানে পৌঁছলো—সে প্রথমটা বিশ্বাসই করতে চাইলে না, তারপর সরকারী ঢ্যাঁড়া যখন সদর রাস্তা দিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে সবাইকে ঘোষণা করে জানিয়ে দিলে—তখন কুঁড়েরাম হঠাৎ মূর্ছা গেল।

অনেক কষ্টে পরীর দল মাথায় শিশির ঢেলে তার মূর্ছা ভাঙালে, কিন্তু হলে হবে কি—কুঁড়েরাম ততক্ষণে ভেউ-ভেউ করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। এই সবে সে ফুলের পাপড়ি দিয়ে চমৎকার একটি লেপ তৈরি করেছে—তার দশা কি হবে এই ভাবনায় তাকে থামিয়ে রাখা শক্ত হয়ে উঠল। যা হোক—সকলেরই কাজ আছে, কেউ তো সারাদিন কুঁড়েরামের পাশে বসে থাকতে পারে না! আস্তে আস্তে যে যার মতো সরে পড়লো। কুঁড়েরাম ভেবে দেখলে, খানিক বাদেই রানীর পেয়াদা এসে তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে—কাজ না করলে।

কাজেই সে সাধের লেপটা কাঁধে নিয়ে এক-পা দু'-পা করে এক বনের মধ্যে চলে গেল, সেখানে এক গন্ধরাজ ফুলের পাপড়ির ভেতরে লুকিয়ে চমৎকার নাক ডাকিয়ে ঘুম দিলে। রানীর আদেশে একদল পরী গন্ধরাজের ফুলের সুবাস সংগ্রহ করতে এসেছিল এই বনে।

এফুল ওফুল করে ঘুরতে ঘুরতে তারা কুঁড়েরামকে দেখতে পেলে—মহা আনন্দে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ইতিমধ্যে কুঁড়েরামের পালানোর খবর পেয়ে রানী আবার ঘোষণা করেছিলেন যে, যে তাকে ধরে আনতে পারবে—সে পাবে প্রচুর পুরস্কার। ফুলের গন্ধ যোগাড় করতে এসেছিল যে পরীর দল—তারা ভাবলে—এ এক মন্দ মজা হবে না। ওকে চ্যাং-দোলা করে ধরে নিয়ে যেতে পারলে রানী খুশী হবেন, তার ওপর মিলবে অনেক পুরস্কার। যেই সবাই মিলে কুঁড়েরামকে বেঁধে ফেলতে যাবে—হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙে গেল। এক লহমায় ও ব্যাপারটা সব বুঝে নিলে, তারপর একেবারে লম্বা ছুট! ও যত ছোটে, পেছনের দল ছোটে তার চাইতে বেশি। কখনো উড়ে, কখনো হেঁটে—এ যেন বড় এক ছুটোছুটি খেলা!

কুঁড়েরাম ওদের চাইতে অলস একথা সত্যি; কতক্ষণ আর ছুটে ওদের নাগালের বাইরে থাকবে? ভেবে দেখলে ধরা ওকে পড়তেই হবে।

সে তাই একটা কুঁড়েঘর সামনে পেয়ে—হঠাৎ একটা বেড়াল-ছানা হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে মিউ-মিউ শব্দ করতে লাগলো।

তোমরা সবাই জেনে রাখো পরীরা ইচ্ছে করলেই যে কোন রূপ ধরতে পারে।

যারা পেছু নিয়েছিলো—তারা ছুটতে এসে দেখে কুঁড়েরাম সেখানে নেই, একটা বেড়াল শুধু আপন মনে ডাকছে! কুঁড়েরাম অন্য কোন দিকে গেছে মনে করে ওরা দল বেধে আবার তাকে খুঁজতে চলে গেল।

খানিক বাদে সাঁঝের আঁধার এলো ঘনিয়ে। এলো ঝড়, আর সেই সঙ্গে এলো মুষলধারে বৃষ্টি।

একটা ছোট মেয়ে কুঁড়ের দরজার বাইরে শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখে একটি বেড়ালের বাচ্চা মিউ-মিউ করে কাঁদছে।

মেয়েটি আদর করে ওকে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। গরম দুধ খেতে দিলে, তারপর নিজের বিছানায় শুইয়ে রাখলে।

কুঁড়েরাম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে—ঘরের ভেতর খুকু আর তার মা, মায়ের বয়স হয়েছে, রোগে ভুগছে, তাদের আর কেউ নেই। বড্ড গরীব তারা। চাকর রাখতে পারে না, খুকুকে সব কাজ নিজে হাতে করতে হয়।

খুকু এত উপকার করলে তাই ওদের দুঃখ দেখে কুঁড়েরামের বড় কষ্ট হ'ল। কুঁড়েরাম ঠিক করলে রাত্তিরে মা আর মেয়ে ঘুমুলে সে নিজে উঠে ওদের সব কাজ করে রাখবে।

করলেও তাই।

ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে বাসন ধুয়ে এমন কি সকালবেলার রান্না শেষ করে রাখলে। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খুকু সব দেখে একেবারে অবাক! কুঁড়েরাম কিন্তু ততক্ষণে আবার বিড়ালছানা হয়ে মুখ লুকিয়ে হাসছে।

খুকু লাফাতে লাফাতে তার মায়ের কাছে গিয়ে সব কথা

বললে। তার মা সমস্ত শুনে বললে, নিশ্চয়ই কোন পরী এসে আমাদের দুঃখু দেখে এই সব কাজ করে গেছে।

অমনি ভাবে রোজ রাত্তিরে কুঁড়েরাম উঠে সব কাজ শেষ করে আবার সকালে বেড়ালছানা হয়ে থাকতো। শুধু তাই নয় ও রোজ চরকায় সুতো কেটে আর নানা রকম খেলনা তৈরি করে রেখে দিত। খুকু তাই বাজারে বিক্রি করে পয়সা আনতো।

এমনি ভাবে এক বছরের মধ্যেই ওদের অবস্থা বেশ ফিরে গেল। এখন আর খুকুদের কোন কষ্ট নেই। ও কুঁড়ে ভেঙে ফেলে দালান তৈরী করল।

কুঁড়েরামের আর দালানে মন টেকে না। চিরদিন বনে বনে ফুলের মধু খেয়ে থাকা অভ্যাস পরীদের, তারা কি করে দালানের ভিতরে থাকবে? ও ভাবলে, এতদিন নিশ্চয়ই পরীরা তার কুঁড়েমীর কথা ভুলে গেছে, আর এভাবে দেশ ছেড়ে কতদিনই বা থাকা যায়?

এই সব ভেবে ও একদিন পরীর দেশে রওনা হ'ল।

কিন্তু সেখানে পৌঁছবামাত্র একদল পরী এসে তাকে বন্দী করে একেবারে রানীর কাছে নিয়ে হাজির করলে।

রানী বললেন, 'এদ্দিন পরে তোমায় পেয়েছি কুঁড়েরাম, এইবার তোমাকে শাস্তি দেব।'

ব্যাপার দেখে ভয়ে কুঁড়েরামের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল। ভাবলে, কেনই বা মরতে আবার পরীরাজ্যে ও ফিরে এলো! খুকু রোজ কত আদর করে তাকে দুধমাখা ভাত খাওয়াতো! সেই সুখের সংসার ফেলে দেশে ফিরে এসে বুঝি তার প্রাণ যায়!

কি অবাক কাণ্ড!

শাস্তি দিতে উঠে রানী যা বললেন, তা শুনে গোটা পরীরাজ্য একেবারে থ বনে গেল!

রানী বললেন, 'কুঁড়েরাম, তুমি মনে করেছ আমার চোখে ধুলো দিয়ে এদ্দিন লুকিয়েছিলে! কিন্তু তা না। তোমার সমস্ত কাজ আমি দেখে এসেছি; পরের উপকারের জন্য রাতের পর রাত তুমি যে পরিশ্রম করেছ, তা আমার নিজের চোখে দেখা। আর তোমাকে কুঁড়ে বলা চলে না। তুমি আমার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মী। তোমাকে করবো আমার মন্ত্রী—সেই হবে তোমার যোগ্য পুরস্কার।'



রূপেশ্বরী রাজকন্যা

ইন্দিরা দেবী

মেয়ের রূপ দেখলে পথের লোক থমকে দাঁড়ায়—দেখে দেখে যেন চোখের আশা মেটে না। এমন সুন্দরী মেয়ে, এমন নিখুঁত গঠন, এমন চোখ, এমন মুখ, এত রূপ কেউ কখনও দেখে নি। রাজার গর্ব। রানীর মনেও অহঙ্কার—এমন সুন্দরী মেয়ে আর হয় না।

ছোট থেকে সুন্দরী সুন্দরী শুনতে শুনতে রূপেশ্বরী মনে মনে এত অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিল যে কাউকে আর সুন্দর মনে হতো না তার নিজের চেয়ে—।

রূপের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছিল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—তাই অনেক বিয়ের সম্বন্ধও আসছিল—কিন্তু হলে কি হয়, পছন্দ আর হয় না। যদি রাজারানীর পছন্দ হলো তো রূপেশ্বরী রূপবান্ রাজপুত্রদের দেখেও মুখ বাঁকিয়ে বলতো—মাগো কি বিচ্ছিরী !

বিয়ে করার কথা ভুলে গিয়ে সেই সব ভিনদেশের রাজপুত্তুরেরা অপমান বোধ করে মনে মনে প্রতিশোধের সঙ্কল্প নিয়ে চলে যেতো।

দিন কেটে যায়। এমনি করে দিন যেতে যেতে বিয়ে আর হয় না।

বয়স বাড়তে লাগলো। রূপেশ্বরীর সঙ্গিনীদের এক এক করে সব বিয়ে হয়ে গেল। তারা যখন বাপের বাড়ি আসতো রূপেশ্বরীর সঙ্গে রাজবাড়িতে দেখা করতে এসে বলতো : ওমা, রূপো তোর এখনও বিয়ে হলো না ?

রূপেশ্বরীর মুখ লাল হয়ে উঠতো। সঙ্গিনীরা বুঝতে পারতো কথাটা বলা ভাল হয় নি তাদের। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলতো, কবে করবি—বলে রাখ। আমরা শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটি নিয়ে আসবো।

রূপেশ্বরীর মনে যাই থাকুক, মুখে বলতো : হ্যাঁরে হ্যাঁ, পাঠাবো তোদের লাল চিঠি। আমার চেয়ে সুন্দর বর পেলে বিয়ে করবো। রাজার বয়স হয়েছে রানীরও তাই। চোখে দৃষ্টি কমে যাচ্ছে, ছেলে নেই, রূপেশ্বরীই একমাত্র মেয়ে। তার বিয়ে দেবেন, জামাই এলে তাকেই সিংহাসনে বসাবেন—রাজত্ব দেবেন। সেই কথায় বলে—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা। এ আবার অর্ধেক নয়—পুরোই।

এতদিন পর্যন্ত যে-সব রাজপুত্ররা ফিরে গেছে, তাদের অপমানের কথা তারা তো এত শীঘ্র ভুলে যায় নি! এদিকে হলো কি, আর কেউই আসে না সুন্দরী মেয়ে রূপেশ্বরীর খোঁজে।

রাজবাড়ির ব্যাপার—তার উপর স্বয়ং রাজকন্যার বর নির্বাচন; যখন কিছুতেই আর হলো না, প্রজারা সবাই বলাবলি করতে লাগলো। রাজা রানী, রূপেশ্বরী কেউ সে আলোচনা থেকে বাদ গেল না। সব কথাই রাজার কানে আসতে লাগলো। মনে মনে ভীষণ রেগে গেলেও কথাটা যে ঠিক—সে কথা রাজা মনে মনে জানতেন। একদিন রাজা রানীকে বললেন : দেখ, এখনও যদি রূপো মন ঠিক করে কাউকে বিয়ে না করে, তাহলে আমি নিজে এবার এ বিষয়ের ব্যবস্থা করবো। আমার দিন ফুরিয়ে আসছে, তারপর এই রাজ্যের কি হবে ? সুন্দরী মেয়ে বলে সারাজীবন কেটে যাবে—বিয়ে হবে না! আর একবার বরং শেষ বারের মত চেষ্টা কর। যাতে ভিনদেশের

রাজার ছেলেরা এসে বিয়ে করে—আর তা যদি না হয় তাহলে আমার যা মনে আছে—আমি করবোই।

রানীরও মনের কথা তাই। কিন্তু আদরের সুন্দরী মেয়ে—ছোটবেলা থেকে অন্যায় আদরে যার স্বভাব বিপরীত হয়ে গেছে তাকে আর এখন সংশোধন করা যাবে কেমন করে! তাই মেয়েকে বললেন ঃ দেখ বাছা, এবার একটা বিয়ে-থা করে নাও। রাজার বয়স হয়ে যাচ্ছে আমারও ভাল লাগছে না। তোমারও তো বয়স কম হলো না! সুন্দরের অহঙ্কার ছাড়ো। রূপেশ্বরীর রূপের গর্ব আর কি সহজে যায়! বললে ঃ মনের মত না হলে, আমার চেয়ে সুন্দর না হলে বিয়ে করবো কি করে? তাহলে ঐ যে রাখাল সকালে গোরু নিয়ে যায় তাকে বিয়ে করলেই হয়! রানী মেয়ের কথায় খুব রেগে গেলেন—মনে মনে বললেন ঃ অদৃষ্টে তোমার তাই আছে হয়তো, অহঙ্কারের সীমা নেই তোমার।

রাজার আদেশে রূপেশ্বরীর বিয়ের জন্য আবার স্বয়ংবর-সভা ডাকা হলো। দেশ-বিদেশে খবর গেল। বাইরে ঢেঁড়া দেওয়া হলো। চারদিকে লোক ছুটলো দেশ-দেশান্তর থেকে, যাতে রাজার ছেলেরা আসে।

অনেক চিঠিপত্র খবরাখবর এলো। রাজা রানীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ এই সভা যেন পণ্ড না হয়। তা যদি হয় তাহলে আমি কাল সকালে উঠে যার মুখ দেখবো তার হাতেই মেয়ে দেবো।

রূপেশ্বরীর কানেও কথা গেল। সুন্দর করে সাজানো সভাতে যাবার জন্য নিজেও সুন্দর করে সেজে রইল। মনে মনে কিন্তু সে ভেবেই ছিল যে তার চেয়ে সুন্দর না হলে গলায় মালা দেবে না।

কিন্তু কি হলো! এত আয়োজন, এত হৈচৈ, সমস্ত রাজ্যে উৎসব—আর একটি রাজপুত্তুর এমন কি মন্ত্রীপুত্তুর, কোটালপুত্তুরেরও দেখা নেই! অপেক্ষা করে করে সন্ধ্যা নেমে এলো, সভা সাজানো, বাজনা বাজানো সব বৃথা গেল; রাগে দুঃখে লজ্জায় রাজা পাগলের

মত হয়ে উঠলেন। অপমানে, লজ্জায় রূপেশ্বরীরও মুখ কালো হয়ে গেল।

সমস্ত উৎসব আয়োজন পণ্ড হয়ে গেল। রাজা অন্দরমহলে এসে রাগে ফেটে পড়ে রানীকে বললেন ঃ কাল সকালে উঠে আমি যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই রূপোর বিয়ে দেবো।

রানী জানেন রাজার কথা নড়চড় হবার নয়। কি করবেন ভেবে না পেয়ে সারারাত জেগে কাটালেন। ভোরবেলা জানলা দিয়ে দেখছেন রাজা ঘুম থেকে উঠেছেন কিনা। ওমা! কোন্ সকালে রাজা শোবার ঘরের সামনে অলিন্দায় বসে আছেন, ভাল করে তখন ফরসাও হয় নি।

ভয়ে রানীর মুখ শুকিয়ে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে পথের দিকে তাকাতেই দেখলেন রাখাল একদল গোরু নিয়ে মাঠে চলেছে। রাজা উঠে দাঁড়িয়ে হাতের ইঙ্গিতে তাকে ডাকলেন। রাখাল অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল। বুঝতেই পারছিল না তাকে কেউ ডাকছে। তাছাড়া রাজপ্রাসাদ থেকে তার ডাক আসতে পারে এমন চিন্তা তার হবেই বা কি করে! তাই আপন মনেই চলছিল গোরুর পাল তাড়াতে তাড়াতে।

বেশ খানিক দূর এগিয়ে গেছে—এমন সময় মনে হলো কে যেন তাকে থামতে বলছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো একদল লোক আসছে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হলো তারা রাজবাড়ির লোক। রাখাল থমকে দাঁড়ালো। তারা কাছে এসে নমস্কার করে বললে ঃ রাজামশাই ডাকছেন।

রাখাল ভয়ে থ হয়ে গেছে। কেন রে বাবা! আমি তো কিছু করি নি! কিন্তু—যেতে যখন হবেই কথা বলে লাভ নেই।

লোকরা একটা পাল্কী এনেছিল—সুন্দর সোনা মুক্তা মোড়া! পাল্কীতে যখন তাকে উঠতে বলা হলো—তখন আরো ভয় পেয়ে গেল রাখাল। বাড়ির কথা মা'র কথা মনে হতে লাগলো।

রাজ-অনুচরেরা তাকে সসম্ভ্রমে পাল্কীতে উঠিয়ে নিয়ে একেবারে রাজপ্রাসাদে চলে এলো।

সব শুনে রাখাল তো অবাক! সে ভীত হয়ে পড়লো আরো! সকালবেলাই একি কাণ্ড!

অন্দরমহলে তখন রানী চোখ মুছছেন, রূপেশ্বরী রাগে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবে কুক্ষণে মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়েছিল রাখালের সঙ্গে তার বিয়ে হলেই হয়। সকলেরই মুখ বিষাদ-গম্ভীর। কিন্তু তবু বিয়ে হবেই—রাজার কথার নড়চড় হবে না।

কিন্তু এতক্ষণে রাখালের মুখ খুলেছে। সে রাজাকে সবিনয়ে বললে ঃ আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, তবে আমার কিছু কথা আছে—তা আপনাকে রাখতেই হবে।

রাজা বললেন ঃ নিশ্চয়ই। বলো তোমার কি কথা? রাখাল বললে ঃ বিয়ের পর আমি বউ নিয়ে আমার বাড়ি যাবো। আমার মা আছেন, ভাইবোনরা আছে। তাছাড়া আমার স্ত্রী যে হবে সে আমার বাড়ি গিয়ে থাকবে। রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিয়েটা তিনি নিতান্ত রাগের বশে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন। কিন্তু তাই বলে রূপো গিয়ে একটা রাখালের কুটিরে বাস করবে কি করে? যেখানে নোংরা-ময়লা, গোরু-গোবরে ভরা, যে বাড়ির লোকরা খেতে পায় না!

রাজা বললেন ঃ কিন্তু—

রাখাল দৃঢ়কণ্ঠে বললে ঃ কোন কিন্তু তো নেই মহারাজ! এই তো নিয়ম।

—কিন্তু আমি আমার জামাইকে শুধু কন্যা দান করবো তা তো নয়? এই রাজত্ব, প্রাসাদ, সিংহাসন সবই তাকে দেবো। আমার ছেলে নেই; তাই জামাইকে আমি রাজা করবো। কাজেই সকলকে এখানেই থাকতে হবে। তোমার বাড়িতে যাঁরা আছেন—মা, ভাই-বোন সবাইকে নিয়ে এসো এখানে।

রাখাল বললে : ভবিষ্যতে কি হবে তা আমি এখনই কথা দিতে পাচ্ছি না আপনাকে—কিন্তু এখন বিয়ের পরই আমার স্ত্রীকে আমার বাড়ি যেতে হবে। সিংহাসন দেওয়াটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু যে নেবে তারও তো একটা ইচ্ছা আছে ?

রাজা অবাক, বলে কি একটা রাখাল ছেলে! সিংহাসন, রাজ্য, রাজকন্যার কিছুতেই তার লোভ নেই। আর যে-সব কথা সে বলছে, যুক্তির দিক থেকে একটাকেও অস্বীকার করা যায় না। রাজা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাখালকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু রাখালের কথা নড়চড় নেই।

রাজ-অন্তঃপুরে কথাটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। রানী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন—বিয়েটা পর্যন্ত তিনি মেনে নিয়েছিলেন নিরুপায় হয়ে—আবার রূপো যাবে গোয়ালঘরে বাস করতে ? রাখাল ছেলেটার স্পর্ধা তো কম নয়! এ কিছুতেই হবে না। বলে কি দেখ! ঘুঁটে কুড়ুনীর ব্যাটা পদ্মলোচন! এত সুখ কপালে কোনো কালে হতো ? গোরু আর গোবরে তো মানুষ! পেটে অন্ন জোটে না।

ঠিক এইরকম চিন্তা চলছিল রূপেশ্বরীর মনের মধ্যে, এই ছিল অদৃষ্টে! জুটলো একটি রাখাল, আর থাকতে হবে গিয়ে গোরু-গোবরের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে ? কখনও না। বাবা রাগের মাথায় একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছেন—তাই বিয়ে হবে। কিন্তু ঐ লোকটা থাকবে চাকরদের ঘরে, আমি যেমন আছি তেমনি থাকবো। রাগে দুঃখে রূপেশ্বরীর মুখ আগুনের মত হয়ে উঠলো। গায়ের গয়না ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো, চন্দন মুছে ফেললো, বেনারসীখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। যে কাছে এসে কিছু বলতে যাচ্ছে, তাকেই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলায় নহবৎ বাজলো—শাঁক উলুর শব্দ শোনা

গেল—বিয়ে হয়ে গেল। রূপেশ্বরী তাকিয়ে দেখলো না একবার। গলায় মালা দেবার সময় চোখ বন্ধ করে রইল সে।

পরের দিন সকালবেলা রাখাল বলে : চল গো রাজকন্যে আমার ঘরে। ওসব কাপড়চোপড় ছাড়ো। ওখানে গিয়ে মা'র সঙ্গে ঘুঁটে দিতে হবে, গোয়াল পরিষ্কার করতে হবে। তাই ওসব পরে না যাওয়াই ভালো। চল চল—এতক্ষণ আমার গোরুগুলো কোথায় এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়লো—একটা দিনরাত তোমাদের বাড়িতে আমি বন্ধ রইলাম। আমার মা কিছু জানে না। আমার জন্য তার সইয়ের মেয়েকে ঠিক করে রেখেছে বিয়ে দেবে বলে। ফুলকুমারী মেয়েটা খুব কাজের কিনা! সেইজন্য মা'র ভারি পছন্দ তাকে। তোমায় নিয়ে যাবো, আর কাল থেকে আমি বাড়িতে নেই, মা যে কত রাগ করবে তাই ভাবছি। তা দেখ, আমার সঙ্গে তুমি ওখানে গিয়েই মাকে প্রণাম করো, আর হাত থেকে গোবরের বাল্‌তি, খড়কুটো সব নিয়ে নিও। একটু কাজকর্ম করলেই মা খুশী হবে। তোমার তো আবার অভ্যেস নেই তাই বলে দিচ্ছি।

রানী দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন—বলে উঠলেন : কি বলছো তুমি? আর কাকে বলছো জানো? আমার মেয়ে গিয়ে গোবর দেবে আর কাজ করবে? তুমি একাই যাও এখান থেকে। আমার মেয়ে যাবে না।

রাখাল বেশ শান্ত গলায় বললে : আপনি বললে তো হবে না, রাজামশাই-এর সঙ্গে আমার সব কথা হয়ে গেছে। কাজেই আপনার মেয়েকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে, আর আমরা তো গরীব লোক—গোরু, গোবর নিয়ে কারবার। তাই কাজ তো করতেই হবে ঐ সব নিয়ে। আর দেরি করে লাভ নেই। আমার মা খুব ভাবছে। কাল থেকে আমি বাড়ি ছাড়া।

রাজামশাই এসে একটু বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বৃথা। এসব কথা তো কালই হয়ে গেছে।

কাঁদতে কাঁদতে রূপেশ্বরীকে পাল্কীতে উঠতে হলো। রাখাল বললে ঃ এটুকু পথ তুমি হেঁটে যেতে পারবে না ? তবে পাল্কীতেই চলো। কিন্তু একটু আগেই নেমে পড়ো, পাল্কী দেখলে মা আমার রেগে যাবে কিন্তু। আমরা সবাই হেঁটে হেঁটে কাজ করি। এদিক-ওদিক যাই। ওদিকে রানী যত কাঁদেন এদিকে রূপেশ্বরী তত কাঁদে। ওদের কান্নায় রাজারও মন খারাপ। ঘটনাচক্রে যাই ঘটুক, রূপেশ্বরী যে আদরের মেয়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পাল্কী করেই রূপেশ্বরী গেল—আর রাখাল তার নিজের আধ ময়লা পোশাক পরে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চললো। লোকজন সঙ্গে নিতে দেয় নি—শুধুই বাহকরা যাচ্ছে। পথ আর ফুরোয় না। দুঃখের পথ দীর্ঘ হয়, সে কথা আজ রূপেশ্বরীর বেশি করে মনে হলো যেন। কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছে, অহঙ্কার মানুষের কত সর্বনাশ করে সে কথা বারে বারে মনে হ'তে লাগলো তার।

একটা খড়ের ঘরের সামনে এসে পাল্কী থামলে রাখাল বললে ঃ তোমরা এবার চলে যাও। রাজকন্যা নেমে আসুক।

ঘরের অবস্থা দেখে পাল্কী-বেহারাও অবাক! রাজার বাড়ির দাসদাসীও এর চেয়ে ভাল ঘরে থাকে—আর রাজকন্যা কিনা এই বাড়িতে থাকবে! কি কাণ্ড! অবাক হয়ে সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। এমন সময় এক বাল্‌তি গোবর নিয়ে—হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, হাত-পা ময়লা একজন স্ত্রীলোক এসে বললে ঃ কাল থেকে কোথায় ছিলি রে! গোরু-বাছুর নিয়ে আমি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। কোন্‌টা কম্‌নে চলে গেল তার ঠিক নেই—কি ব্যাপারটা কি ?

বিয়ে হলো যে!

—বিয়ে! কার ?

—আমার। ঐ তো পাল্কীর মধ্যে বউ রয়েছে।

—বউ! বিস্ময়ে আকাশপানে হাঁ করে রাখালের মা

বললে ঃ তাহলে ফুলকুমারীর কি হবে? সইকে আমি কি বলবো? গোরু-বাছুর চরাতে গিয়ে বিয়ে করে এসেছ? চালাকী করার জায়গা পাও নি! যাও শীগ্গীর গোয়ালে! বিয়ের মজা দেখাচ্ছি। ওটা কে—মেয়েটা?

—রাজার মেয়ে! সকালে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলে।

তুই বললি না কেন আমার বিয়ে ঠিক হয় আছে? এখন এই বউটাকে নিয়ে আমি করবো কি? রাখাল বললে ঃ কাজ-কর্ম করবে, থাকবে—তোমার বড্ড খাটুনী হয়—ও সঙ্গে সঙ্গে করবে। রাতে তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেবে।

ওসব কথা শুনতে চাই না। ওটাকে কোথা থেকে এনেছিস এখুনি বিদেয় করে দে। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো রাখালের মা।

রাখাল বললে ঃ বিয়ে করে এনেছি, বিদেয় করবো কি করে! রূপেশ্বরীর মরে যেতে ইচ্ছা করছে একথা শুনে। তবু ভাবছে—রাখাল যেন তার মা'র কথা শুনে এখনি বিদায় দেয়—তাহলে সে যেন বাঁচে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার।

কিন্তু হলো না। তাকে নামতেই হলো। পাল্কী-বেহারারা মলিন মুখে চলে গেল আর মাথা হেঁট করে রূপেশ্বরী সেই কুটীরে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকে কি করবে—কোথায় দাঁড়াবে ভেবে পায় না। ক'টা ছেলেমেয়ে প্রায় অর্ধ উলঙ্গ—এসে বললে ঃ তুমি রাজকন্যে! আমাদের বাড়ি এসেছ বৌদি হয়ে! তাহলে চল রান্না করে খেতে দেবে।

সাজ-পোশাক ছেড়ে তাদের সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়ে রূপেশ্বরীর আরো কান্না পেতে লাগলো। এই রান্নাঘর, এই খাবার-দাবার!

কিন্তু যেখানে যাচ্ছে সেখানেই তাই। ময়লা ছেঁড়া কাঁথায় শুতে গিয়ে বমি আসতে লাগলো। রাখাল বললে ঃ এখনি

শুয়ে পড়লে কেন? আমার মা সারাদিন খাটছে। গোরু-বাছুর-গোবর নিয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। বড় কষ্ট, যাও তুমি গিয়ে একটু পা টিপে দাও। রূপেশ্বরী চিৎকার করে উঠলোঃ না, না আমি পারবো না। এই ক' ঘণ্টাতে আমি আধমরা হয়ে গেছি। ঐ নোংরা পায়ে হাত দিয়ে আর আমি থাকতে চাইনে। এখনি আমায় পাঠিয়ে দাও আমার বাপের বাড়ি।

রাখালের গলার আওয়াজ তেমনি নরমঃ বললে তা কি করে হবে, তোমার বাবা আমাকে ডেকে বিয়ে দিয়েছেন—মেয়ে দান করে দিয়েছেন, কি করে আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো বল? যাও—যাও আর কথা বাড়িও না, মা'র কাছে যাও—মা একেই ফুলকুমারীর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারে নি বলে রেগে আছে।

অগত্যা কি আর করবে রূপেশ্বরী! সেই ময়লা বিছানায় ময়লা কাপড় পরা, হাতে-পায়ে হাজাধরা রাখালের মা শুয়ে ছিল যেখানে সেখানে গিয়ে বসতে হলো।

পনেরো দিন এইভাবে কেটেছে। রূপেশ্বরীর রূপ কোথায় মিলিয়ে গেছে। রোগা কালো একটা কঙ্কাল চেহারা। কলসী নিয়ে পুকুরে জল আনতে গিয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে। মাথার ওপর চড়া রোদ। ক্ষিদে-তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে।

একটা লাঠি হাতে নিয়ে ঠুকঠুকে এক বুড়ী এসে ঘাটের পাড়ে দাঁড়ালো। রূপেশ্বরীকে দেখে বললেঃ হ্যাঁগা বউ, আমায় একটু জল দাও না। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। রূপেশ্বরী চোখ মুছে বুড়ীকে জল এনে দিল। বুড়ী বললেঃ কাঁদছো কেন গা?

রূপেশ্বরী আরো জোরে কেঁদে উঠে বললেঃ আমি আর পাচ্ছি না। জলে ডুবে মরবো।

বুড়ী আস্তে আস্তে তাকে বুঝিয়ে সব কথা শুনলো। আবার বললেঃ শোনো গো বউ! কোনো মানুষের অহঙ্কার থাকা ভালো নয়। তুমি কত লোককে অপমান করেছ রূপের দেমাকে! মনে পড়ে

কি? তারা তোমার দেওয়া অপমান ভুলতে পারে নি। তুমি কি এখন নিজের দোষ বুঝতে পেরেছ — অনুতপ্ত হয়েছ?

—হয়েছি, হয়েছি—আমি সব বুঝেছি, আমায় ক্ষমা কর।

—আচ্ছা, মনে রেখো কোনও মানুষকে অকারণ অপমান করার অধিকার তোমার নেই।

এই বলে বুড়ী লাঠিটা তুলে রূপেশ্বরীর মাথায় একটু আস্তে করে ঘা দিল।

ওমা এ কী! এ কী কাণ্ড! কোথায় এলাম!! ঝলমলে রাজপ্রাসাদের একটা ঘরে দাঁড়িয়ে আছে রূপেশ্বরী। রাখালের মত মুখ এক রাজপুত্তুর তার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে, বলছে—অন্য কোথাও আস নি, নিজের শ্বশুরবাড়িতেই এসেছ। আমি চম্পানগরের রাজার ছেলে, যাকে স্বয়ংবর-সভায় কালো বিচ্ছিরী বলে অপমান করেছিলে। মনে আছে? পুরোনো কথা থাক এখন, আমি রাখাল নই, সেজেছিলাম—তোমার জন্যই আমাদের এত অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। চল আমার বাবা-মা'র কাছে।

চম্পানগরের রাজা-রানী এলেন—এসো মা এসো, ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসো বলে হীরার মুকুট পরিয়ে দিলেন।

রাজা বললেনঃ সকলকে জানিয়ে দাও এক সপ্তাহ আমার রাজ্যে উৎসব চলবে। আর এখনি স্বুবর্ণের পাল্কী আর সাত ঘোড়ার গাড়ী পাঠাও রূপেশ্বরীর বাবা, মাকে আনতে। তাদের মেয়ের রাখালের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে কাঁদছেন—এখন এসে দেখে যান—কোথায় সে আছে।

রূপেশ্বরী নত হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলো—এই রাজপ্রাসাদ, এত ঐশ্বর্য—এ তো তার বাপের বাড়ির চেয়ে অনেক বড়। অনেক বিশাল। স্বপ্ন দেখছে না তো?

তার মনের কথা বুঝতে পেরে রাজপুত্তুর বললেঃ কোনটাই স্বপ্ন নয়? সব সত্যি।



কুটুর কুটুর নেংটি ইঁদুর।

কিন্তু নেংটি ইঁদুর বলে ডাকলে সে ক্ষেপে যায়।

তাকে বলতে হয়—কুটকুট বাহাদুর।

অন্যান্য ইঁদুরের মত সে গর্তে থাকে না। বিচ্ছিরি নোংরা জঞ্জালের মধ্যেও থাকতে ভালবাসে না সে।

সে আছে মহা আরামে ডাক্তার ভোসের খাস কামরায়। শুধু খাস কামরায় নয়—তাঁর দামী আলমারিটার এক কোণে।

কি চকচকে আলমারি—কি ঝকঝকে সব জিনিসপত্তর। তার একপাশে থাকে সে। কাজেই দেমাকের তার অন্ত নেই।

নেংটি ইঁদুর বললে ক্ষেপে যাবে না?

তাই তাকে বলতে হয়—কুটকুট বাহাদুর।

তার দেমাকের আরো কারণ আছে। সে বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে কিছুদিন আগে। মিথ্যে নয়—কথাটা একবারে সত্যি।

তার মুনিব ডাক্তার ভোস গিয়েছিলেন বিলেতে একটা ডাক্তারী

ডিগ্রী নিতে। তাঁর লাটবহরের সঙ্গে সেও চুপি চুপি চলে গিয়েছিল বিলেতে। কখনো তাঁর হোল্ডলে কখনো তাঁর নানা জিনিসপত্তরের মধ্যে লুকিয়ে বেশ আরামে কাটিয়ে এসেছে অনেকগুলো দিন।

তার মুনিব ডিগ্রী নিয়ে এসেছে—খুব লম্বা একটা ডিগ্রী। তাঁর নামের পেছনে জুড়ে দিয়েছে এ বি সি ডি-র মত কতগুলো অক্ষর, নেংটি তা বুঝতে পারে না। তবে এটা বুঝতে পারে—বিলেত থেকে এসে ডাক্তার বসু হয়ে গেছেন ডাক্তার ভোস।

ডাক্তারের নাম যদি পালটাতে পারে তবে তার নাম পালটাবে না কেন? তাই তার নাম নেংটি ইঁদুর না হয়ে হয়েছে কুটকুট বাহাদুর। ডিগ্রী সে নাই পেল। বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে তো! তার বাহাদুরি কি কম?

ডাক্তার যখন ঘরে বসে রোগী দেখে সে দূর থেকে বইপত্রের ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে চেয়ে থাকে। সে দেখে ডাক্তার রোগীর বুকের উপর কি একটা যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা করে। কানে নল লাগিয়ে কি যেন দেখে। কিন্তু ঔষধ কাওকে দেয় না—শুধু কাগজে লিখে দেয় ঔষধের ফর্দ।

নেংটিরও ইচ্ছে হয় ঐরকম করে রোগী দেখার। কিন্তু মানুষ রোগীগুলি তো তার কাছে আসবে না। তার কথা বুঝবে না। মনে মনে দুঃখ হয় নেংটির।

একদিন বাড়িতে কেউ ছিল না। ডাক্তার রোগী দেখতে শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। নেংটি তার আস্তানা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে ঘরের বাইরে চলে এল। লাগালাগি আর একটা বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। সেই বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে একটি নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে দেখা হলো। সেই ইঁদুরটি যেন এক টুকরা বাসি রুটি নিয়ে টানাটানি করছিল।

কুটকুট বাহাদুর বলল—ইঁদুর ভায়া, ইঁদুর ভায়া, বাসি রুটি নিয়ে টানাটানি করছ কেন? নেংটি জবাব দিল কি করব, খিদে পেয়েছে যে!

কুটকুট বাহাদুর বলল—তাই বলে অমন বাসি পচা রুটি খাবে?

নেংটি বলল—ওঃ, তুমি বুঝি বিলেত-ফেরত ডাক্তারের বাড়িতে থাকো? তবে তো এমন কথা বলবেই। আমি ক'দিন গিয়েছিলাম ওদের ভাঁড়ার ঘরে। কিন্তু ও বাড়ির চাকরটা ভারি বজ্জাত। এমন করে সব ঢেকে রাখে যে একটুও চুরি করে খাবার জো নেই। তা ভাই নেংটি ইঁদুর, তুমি এ বাড়িতে এসেছ কোন্ দুঃখে?

—আহা, আমাকে নেংটি ইঁদুর বলে ডেকো না। আমার নাম কুটকুট বাহাদুর।

—তাই নাকি!

—জানো, আমিও ডাক্তারের সাথে বিলেত গিয়েছিলাম। কিছু কিছু ডাক্তারী আমিও শিখে এসেছি।

—বল কি! একথা আগে জানাতে হয়। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের মাসতুতো বোন সেদিন হঠাৎ মরে গেল। কি রোগ কিছুই বোঝা গেল না। কোন্ বাড়ি থেকে কি খেয়ে এল তারপর ছটফট করতে লাগল। তারপর পাঁচটা মিনিটও কাটল না, মুখ থুবড়ে মরে গেল। আহা, তোমার মতন ডাক্তারের খোঁজ পেলে কি ও মরত!

—যাক, তোমাকে বলা রইল। কোন রোগীপত্তর পেলে আমাকে ডেকো। না হয় নিয়ে যেও আমার কাছে। চুপি চুপি রাত্তিরবেলায় যেয়ো—যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে।

—আচ্ছা, সে আর বলতে হবে না। আজই আমি সবাইকে জানিয়ে দেব।

কুটকুট বাহাদুরের দেমাক আর ধরে না।

পরদিন রাত্রেই একটি রোগী নিয়ে এসে হাজির হলো নেংটি ইঁদুর। পেটব্যথা।

কুটকুট বাহাদুর খুব ভারিক্কী চালে রোগীর দিকে তাকাল।

মুস্কিল বাঁধল ডাক্তারের সেই নলওয়ালা যন্তরটাকে নিয়ে। টেবিলের ওপর পড়ে আছে যন্তরটা—অথচ দু'জনে চেষ্টা করেও ওটা নাড়তে পারল না।

অগত্যা কুটকুট বাহাদুর খুব গম্ভীর হয়ে রোগীর হাত-পা নেড়ে দেখল, পেট টিপে দেখল, জিভ বার করে দেখল।

তারপর ওষুধের প্রেসক্রিপসন লিখতে গিয়েও ফ্যাসাদে পড়ল। টেবিলের ওপর আছে দোয়াতদানী আর কলম। তা দিয়ে ডাক্তার অবশ্য কিছু লেখে না। দরকার হলে অন্য কেউ লেখে। ডাক্তারের নিজের কলম থাকে বুক পকেটে।

টেবিলের ওপর থেকে কলম নিয়ে লিখতে চেষ্টা করল কুটকুট বাহাদুর। কিন্তু কলমটা বড্ড মোটা আর ভারি। লিখতে খুব কষ্ট হয়। তবু দু'হাত ধরে কোন রকমে লিখল।

পরের দিন এল আর এক রোগী। তার মাথা ধরেছে। কুটকুট বাহাদুর খুব খুশী। তাহলে এবার সত্যি সত্যি সে ডাক্তার হয়ে উঠেছে।

কুটকুট বাহাদুর ডাক্তারী মেজাজ দেখিয়ে রোগীর মাথা টিপে ধরল। তারপর আজও প্রেসক্রিপসন লিখে দিল কাগজে।

কিন্তু তারপর ক'দিন আর কোন রোগীর দেখা নেই। ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কুটকুট বাহাদুর।

ব্যাপারটা কি রকম হলো ?

ভারি অস্বস্তি লাগতে লাগল কুটকুট বাহাদুরের। ডাক্তারী করে একটা ডিগ্রী নেওয়ায় ইচ্ছা ছিল তার। সেটা বুঝি মাঠেই মারা গেল। ইংরিজী এ বি সি ডি অক্ষরের মত কয়েকটা অক্ষর তার নামের পেছনে জুড়ে দিতে পারলে আর কথা ছিল না। একেবারে কেল্লা ফতে হয়ে যেত।

তিন দিন তিন রাত্তির না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটাল কুটকুট বাহাদুর। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমনো কিছুই তার ভাল লাগছে না।

কিন্তু ভেবেই বা কি হবে? বিলেত যাওয়ার আগে তো তার মুনিবেরও রোগীপত্তর কম ছিল। আজ তার নাম হয়েছে বলেই না এত রোগীতে গিসগিস করে তার ঘর।

এই ভেবে মনে একটু সান্ত্বনা পেল কুটকুট বাহাদুর। একটু ঘুমুতে চেষ্টা করল।

একটু তন্দ্রা এসেছে তু'চোখে। এমন সময় কে ডাকল—ইঁত্বর ভায়া, ও নেংটি ইঁত্বর ভায়া!

ঘুম ভেঙে গেল কুটকুট বাহাত্বরের। কিন্তু জ্ঞানের নাড়ী তার টনটনে। বিরক্ত হয়ে বলল—আহা, আমি নেংটি ইঁত্বর নই—কুটকুট বাহাত্বর।

যা হোক, একজন রোগী এসেছে আজ। তাই কুটকুট বাহাত্বরের মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল—তোর কি রোগ হয়েছে?

—আজ্ঞে, দাঁত কনকন করে।

—কবে থেকে?

—কাল থেকে।

—কি খেয়েছিলি?

—কাল সকালবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা চকচকে নতুন কাঠের বাক্স এসেছে, তাই একটু কামড়িয়ে খেয়ে দেখছিলাম।

—কি দেখলি?

—দেখলাম, জিনিসটা মোটেই মিষ্টি নয়।

—ওসব অখাদ্য খাস কেন?

—খেয়েছিলাম পেটের খিদেয়।

—পেটের খিদেয়, না স্বভাবে?

রোগী নেংটি ইঁত্বরটি চুপ করে রইল। ভারি লজ্জা পেয়েছে সে।

কুটকুট বাহাত্বর বলল—তোমাদের ভারি বিচ্ছিরি স্বভাব। গেরস্তের বাড়িতে যা দেখবে তাই কুটুর কুটুর করে কাটবে।

বিলেতে ওসব নেই। তোমাদের স্বভাব পালটানোর জন্য তোমাদের সবার বিলেত যাওয়া উচিত, বুঝলে?

বলেই একটা লম্বা কাগজ খুব লম্বা ওষুধের একটা ফর্দ লিখে দিল কুটকুট বাহাদুর।

এমন সময় আর একটি নেংটি ইঁদুর এসে হাজির হলো, সে আগেকার সেই মাথাধরার রোগী। বলল—নেংটি বাহাদুর—ও নেংটি বাহাদুর!

কুটকুট বাহাদুর ধমকে উঠে বলল—নেংটি বাহাদুর নয়, আমার নাম কুটকুট বাহাদুর, জানিস না?

—ওঃ, ভুল হয়েছে, মাপ করুন।

—কেন এসেছিস?

—আপনার ওষুধে তো কোন ফল পেলুমনা।

—ফল পেলি না, বলিস কি?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, একটু দেরি কর্—আমি ভেবে দেখছি।

কুটকুট বাহাদুর ভাবতে লাগল। সত্যি ভাবতে লাগল। ভেবে ভেবে তার গা বেয়ে ঘাম ছুটতে লাগল। এবার তার মনে হলো ডাক্তার ভোসের ঐ নলওয়ালা যন্তরটা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে নি বলেই হয়তো ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না।

তখন কুটকুট বাহাদুর রোগীকে বলল—আয়, হু'জনে মিলে ঐ যন্তরটা তুলে নি।

রোগী আর ডাক্তার হু'জনে মিলে তুলতে গেল স্টেথিস্কোপটা। কিন্তু ওটা কি বড় আর কি ভারি! কিছুতেই বাগাতে পারল না।

কুটকুট বাহাদুরের মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এল। বলল—আয়, এটাকে কেটে একটু ছোট করে নেই। তাহলেই আর তুলতে কষ্ট হবে না।

দাঁত দিয়ে কটকট করে দু'জনে কাটতে লাগল স্টেথিস্কোপটা। অনেক কসরত করার পর রবারের নলটা একটু কাটতে সক্ষম হলো, কিন্তু দু'ভাগ করতে পারল না। কি বিরাট ঐ নলটা!

হয়রান হয়ে কুটকুট বাহাদুর বলল—আজ থাক্, কাল আবার চেষ্টা করা যাবে। কাল আসবি। নিশ্চয়ই তোর অসুখ সারিয়ে দেব।

নেংটি ইঁদুরটা চলে গেল।

এবার একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করল কুটকুট বাহাদুর। মনটা আজ একটু হালকা—বেশ একটু খুশীও।

একটু পরেই ঘুম এসে গেল।

পরের দিন সকালে কিসের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল কুটকুট বাহাদুরের। ডাক্তার ভোসের গলা শুনতে পাওয়া গেল। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন বাড়ির চাকরকে—কিরে হাঁদারাম, ঘরের জিনিসপত্র দেখেশুনে রাখতে পারিস না?

বোধ হয় যন্তরটা নষ্ট হওয়ার জন্যই ডাক্তার তাকে বকছেন।

কুটকুট বাহাদুর ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে রইল।

ইস্, তার জন্যই না আজ চাকর বেচারা বকুনি খাচ্ছে!

বহুদিন সে এই বাড়িতে আছে অথচ অপরাধটা বুঝি তার জীবনে এই প্রথম।

দুঃখ হলো কুটকুট বাহাদুরের মনে।

সারা দিনটা এমনি ভাবে কেটে গেল।

রাত হলো।

কুটকুট বাহাদুর দেখল ডাক্তারের টেবিলের ওপর সেই যন্তরটা নেই। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তার। আজ রোগী

এলে কি করবে সে? ঐ যন্তরটার অভাবেই তো রোগীর ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না।

কিন্তু আর একটা জিনিস দেখে চোখ চকচক করে উঠল কুটকুট বাহাদুরের। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা বড় মোটা শিশি। তার ভেতর সাদা সাদা কি যেন গুঁড়ো ওষুধ। টেবিলের ওপরও ছড়িয়ে পড়ে আছে সেই গুঁড়ো।

শিশির মুখটা খোলা। হয়তো ভুলে খুলে রেখে গেছে চাকরটা। কাল আবার ঠিক সে মুনিবের কাছে বকুনি খাবে। ওগুলি নিশ্চয়ই কোন দামী ওষুধ। ডাক্তারের ঘরে ওষুধ ছাড়া ও আর কি হবে?

কুটকুট বাহাদুর এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে। ঐ ওষুধ সে কিছুটা তুলে আনবে তার রোগীর জন্য। আজ সব রোগীকে এই ওষুধ দেবে। নির্ঘাত সেরে যাবে সকলের রোগ।

কুটকুট বাহাদুরের নাম ছড়িয়ে যাবে সব ইঁদুর মহলে। এবার সত্যি এ বি সি ডি অক্ষরের মত অনেকগুলো অক্ষর জুড়তে পারবে তার নামের পেছনে।

আনন্দে আর উত্তেজনায় কুটকুট বাহাদুরের মন ভরে উঠল।

কিন্তু কি তীব্র গন্ধ ওষুধগুলোর! ইঁদুর আর আরশোলা মারবার জন্য যে ওষুধ ঘরে ছড়ানো হয়—তা নয় তো?

কিন্তু তা ভাববার সময় নেই কুটকুট বাহাদুরের। সে এর মধ্যে অনেকগুলো ওষুধ তুলে নিয়েছে। খেয়েও দেখেছে একটু।

একটু পরেই তার রোগীরা এসে পড়বে। তার আগেই সব গুছিয়ে নিতে হবে তাকে।

কিন্তু .... একি!

ঘরটা যেন দুলছে। তার চোখের সামনে সব কিছু যেন ঘুরছে। তার আস্তানা যাবার পথটাও গুলিয়ে ফেলেছে সে।

কে যেন ডাকছে—কুটকুট বাহাদুর! কুটকুট বাহাদুর!

রোগীরা বুঝি এসে পড়েছে!

কিন্তু সাড়া দেবার শক্তি নেই তার।

সাড়া না পেয়ে আবার ডাকছে রোগীরা—নেংটি ইঁদুর! ও ভাই নেংটি ইঁদুর!

ইচ্ছা হলো কষে চড় বসিয়ে দেয় ওদের গালে। ক'বার করে মনে করিয়ে দিতে হবে—তার নাম নেংটি ইঁদুর নয়—তার নাম কুটকুট বাহাদুর।

কিন্তু কে দেবে কাকে চড়?

বিলেত-ফেরত কুটকুট বাহাদুরের তখন নাভিশ্বাস উঠছে।



দৈত্যপুরীতে রাখালরাজা

দিলদার

রূপরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে, অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর দিয়ে যে ঝরণা নদী বয়ে গেছে, তার পাশেই ছিল একটা গুপ্ত পথ। যে পথে রূপরাজ্যের কোন লোক যায় না। গুপ্ত পথের আরেক ধারে রয়েছে নিঝুমপুরী। সেই পুরীতে বাস করেন দৈত্যরাজ হিংটং।

এই নিঝুমপুরীতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দৈত্যরাজ হিংটং বসেছিলেন রাজদরবারে।

তার পাশেই রয়েছে ঐ রাজ্যের বড় সেনাপতি সিনসিন আর মহামন্ত্রী লিললিল।

দৈত্যরাজ বললেন, দেখ বাপু, আমার নিঝুমপুরীতে আমরাই থাকবো। অন্য রাজ্যে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তাতে আমাদের কি?

বড় সেনাপতি বললে, তা তো ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু আমরা যদি খবর পাই, আমাদের রাজ্যের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন পৃথিবীর লোক, তাহলে কি হবে?

এই কথা শোনার পর দৈত্যরাজ হিংটিং প্রচণ্ড হেসে বললেন, তার মানে ?

এবার মুখ খুললেন মহামন্ত্রী, বললেন, যদি অভয় দেন—তাহলে বলি।

মহামন্ত্রীর কথা শুনে রেগে গিয়ে দৈত্যরাজ হিংটিং বললেন, ভূমিকা না করে সহজ ভাষায় বল কি হয়েছে ?

মহামন্ত্রী বললেন, আমাদের গুপ্তধনের কাছে এক ভিনদেশীকে দেখা যাচ্ছে। হাতে তার বাঁশী। যতদূর মনে হচ্ছে সে রাখাল-রাজা।

এই কথা শোনার পর দৈত্যরাজ হিংটিং বললেন, পৃথিবীর কোন লোক বা অন্য দেশের কোন লোক যদি হয় তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসো আমার রাজ্যে।

আর যদি সত্যিই রাখালরাজা হয়, হাতে যার বাঁশী তাকে ধরে নিয়ে এসো। তারপর যা করবার আমিই করবো।

এই না বলে দৈত্যরাজ হিংটিং একবার হাসলেন, তারপর বড় সেনাপতি সিনসিনকে বললেন, তোমাকে যার জন্য পাঠিয়েছিলাম, তার হলো কি ? মেঘকন্যাকে যেমন করে হোক এ রাজ্যে আনা চাই। মেঘকন্যাকে এখানে আনলে নিঝুমপুরীর আর কোন ভাবনা নেই।

সেনাপতি বললে, তার জন্য ভাববেন না। আমি ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক মেঘকন্যাকে ধরে আনবো।

এমন সময় এ রাজ্যের বড় দূত চিত্রগ্রীব এসে হাজির, সে একটা মস্ত সেলাম জানিয়ে বললে, মহারাজ সর্বনাশ হয়েছে, গুপ্ত পথের ওপাশে এক ভিনদেশী রাখালরাজাকে দেখা যাচ্ছে। আপনার অনুমতি পেলেই তাকে ধরে নিয়ে আসি।

বড় সেনাপতি বললে, তা আর বলতে! এখনি যাও তাকে ধরে নিয়ে এসো।

রাজা বললেন, এখন নয়, আরও পরে, তুমি ক'দিন লক্ষ্য কর

ওঁর গতিবিধি। তারপর···আর সেনাপতি তুমি এখনি আমার এই মায়াবী আংটির সাহায্যে একটা পাখি হয়ে উড়ে যাও আকাশে। সেখানে গিয়ে যেমন করে হোক মেঘকন্যাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো আমার রাজ্যে।

সেনাপতি বললে, তাই হবে। তাহলে আমায় পাখি করার মন্ত্র দিন।

দৈত্যরাজ বললেন, ঠিক আছে।

তারপর দৈত্যরাজ সিংহাসন থেকে নেমে তাঁর মায়াবী আংটিটাকে হাত থেকে খুললেন। সামনের একটা ঘণ্টায় জোরে আওয়াজ করলেন। আর তখন দেখতে দেখতে কোথা থেকে ছুটে এলো এক ডাইনী বুড়ী।

ডাইনী বুড়ী বললে, বল—কি করতে হবে আমাকে?

রাজা বললেন, তুমি তোমার মন্ত্রবলে সেনাপতি সিনসিনকে একটা চমৎকার লাল টুকটুকে টিয়াপাখি করে দাও।

ডাইনী বুড়ী বললে, ঠিক আছে।

আর যেই না বলা, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি হঠাৎ পড়ে গেল মাটিতে। তখন ডাইনী বুড়ী তার ঝুলি থেকে একটা পাথর বার করে সেনাপতির গায়ের উপর ঘষে দিলে। দেখতে দেখতে সেনাপতি হয়ে গেল একটা পাখি। লাল টুকটুকে টিয়াপাখির বেশ ধরে সেনাপতি বললে, এবার আমাকে আকাশে পাঠিয়ে দাও।

ডাইনী বুড়ী তার মন্ত্রবলে পাখিটাকে উড়িয়ে দিলে আকাশে।

আর লাল টুকটুকে পাখিটা উড়ে চলেছে আকাশের দিকে।

সেই যে রাখালরাজা রূপবতীকে বাঁশী বাজিয়ে শুনিয়েছিল, সেই রাখালরাজা আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে নিঝুমপুরীর সীমানায় এসে হাজির।

রাখালরাজা উঁচুনীচু চমৎকার পাহাড় আর ঝরণা নদীর ধার দেখে তো মনের আনন্দে বিভোর।

হঠাৎ চম্‌কে উঠল রাখালরাজা।

কেন?

সে দেখতে পেল একটা চমৎকার পদ্মফুল ঝরণা নদীর ধারে পড়ে রয়েছে।

হঠাৎ তার মনে হলো রূপরাজ্যের রানী রূপবতীর কথা।

কথায় কথায় বলেছিলেন রানীমা, তুমি যেদিন আসবে ভাই, সেদিন আমার জন্য পদ্মফুল এনো। কেমন?

রাখালরাজা বলেছিল, আনবো রানীমা।

আর আজ সেই পদ্মফুল দেখে তার মনে হলো রানী রূপবতীর কথা।

যেই না ভাবা, আর যেই না পদ্মফুল ধরতে যাবে, হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল চারজন বড় বড় দৈত্য। হাতে তাদের মস্ত বড় বড় বর্শা।

রাখালরাজা ভয় না পেয়েই বললে, কী চাই তোমাদের? আমার কাছে এসেছ কেন? চারজন সিপাইদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়, যার নাম লম্বোদর সে মুচকি হেসে বললে, সেলাম তোমাকে।

ওদের মধ্যে আর একজন সবচেয়ে যে ছোট তার নাম বৃকোদর। সে বললে, আর তার বলার কী ভাষা!

সে বললে, আমরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাব আমাদের রাজ্যে, আমাদের রাজার কাছে। আসলে কি জানো? এই যে পাহাড় দেখছ, এই যে ঝরণা নদীর ধার দেখছ, আর এই পদ্মফুল দেখছ, আর এই যে গুপ্ত পথের সংকেত দেখছ—সবই আমাদের রাজার।

রাখালরাজা বললে, কোন্‌ রাজা? আর কেমন রাজ্য তা তো বললে না?

এবার মুখে হাসি টেনে নিয়ে লম্বোদর বললে, আমাদের রাজার নাম দৈত্যরাজ হিংটিং। আর রাজ্যের নাম নিঝুমপুরী। এই

সীমানায় যাকে পাব, তাকেই ধরে নিয়ে যাব রাজার কাছে। দৈত্যরাজের এই হুকুম।

এই কথা শোনার পর রাখালরাজা বললে, আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি? তাহলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কী লাভ?

রাখালরাজার কথা শুনে লম্বোদর তার লম্বা লম্বা পা ফেলে বাকী হু'জনকে যাদের নাম মহাবীর আর অতিবীর তাদের হুকুম দিলে, ধর এই রাখালরাজাকে।

তারা সেই কথা শোনামাত্র মহাবীর আর অতিবীর রাখাল রাজাকে ধরলে।

রাখালরাজা বললে, যাচ্ছি, কিন্তু আমায় আবার ছেড়ে দেবে তো?

রাখালরাজার কথা শুনে চারজনই একসঙ্গে হেসে উঠলে, ওদের মধ্যে থেকে লম্বোদর বললে, দৈতরাজ ছেড়ে দেবেন কিনা জানি না, আমাদের ধরে নিয়ে যাবার ভার, আমরা তাই ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

এবার লম্বোদর তার জামার পকেট থেকে একটা গুপ্ত সংকেত বার করলে, তারপর রাখালরাজাকে হাত ধরে হাসতে হাসতে বললে, এবার তোমার চোখ হু'টি একবার বন্ধ কর।

রাখালরাজা সত্যি সত্যি তাই করলে।

কিছুক্ষণ পরে যখন রাখালরাজা তার চোখ খুললে, সে দেখতে পেল একটা বিরাট রাজপুরীতে সে এসেছে।

ফটকের সামনে আসতেই দেখতে পেল রাখালরাজা, মস্ত বড় একটা ঘণ্টা, আর সেই ঘণ্টার হু'দিকে হু'জন প্রহরী গোছের লোক।

লম্বোদর সংকেত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীদের মধ্যে একজন রাখালরাজাকে একটা ঘরে নিয়ে এলো।

তারপর একজন প্রহরীকে পাহারায় রেখে লম্বোদর চলে গেল।

রাখালরাজা অসহায়ের মত ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলো।

আর ঘরের জানালার ধার দিয়ে তাকাতেই রাখালরাজা দেখতে পেল বিরাট রাজপুরীটা, সত্যি নিঝুম হয়ে রয়েছে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। একটা লোকও নেই!

হঠাৎ রাখালরাজার কানে এলো বিকট একটা আওয়াজ, যে-সে আওয়াজ নয়—ঘণ্টা বাজার শব্দ! আর সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে রাখালরাজা জানালা দিয়ে দেখতে পেল হাজার হাজার দৈত্যপুরীর অদ্ভুত অদ্ভুত ধরনের লোকেরা আসছে ছুটতে ছুটতে।

কী ব্যাপার?

তখনি কোথা থেকে অতিবীর এসে রাখালরাজাকে কোলপাজা করে দৌড়ে নিয়ে গেল।

রাখালরাজা বাইরে এসে দেখে নানা ধরনের বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত লোকেরা নাচতে শুরু করেছে।

সে কি নাচ!

মাদলের ঝঙ্কারে সবাই একসঙ্গে নাচছে।

তাই না দেখে রাখালরাজা যেই না তার বাজনাটা বাজাতে যাবে, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল রাখালরাজা।

তারপর কী হয়েছিল তা রাখালরাজার মনে নেই।

যখন রাখালরাজার জ্ঞান হলো, তখন দেখলে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখালরাজা একা শুয়ে আছে।

আর হাত-পা দুটোকে খুব শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

যন্ত্রণায় রাখাল রাজা ছটফট করছে। এমন সময় সেই অন্ধকার ঘরে একটা মশাল হাতে একজন প্রহরী এসে হাজির।

সে হেসে বললে, ভয় নেই রাখালরাজা! আজ কী দিন জানো? আমাদের রাজা হিংটং-এর জন্মদিন। তাই নাচ হচ্ছিল। তা বাপু তুমি এই নিঝুমপুরীতে নাচতে এলে কেন? ভয় নেই তোমার, কাল বা আজই রাতে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

অবশ্য তার আগে তোমার বিচার হবে। কেন তুমি পাহাড়ের ওপর এসেছিলে? কেন তুমি ঝরণা নদীর জল খেতে গেলে? আর কেন তুমি পদ্মফুল ধরতে গিয়েছিলে?

এই পর্যন্ত বলে প্রহরী রাখালরাজার মুখের কাছে মস্ত বড় দুটো কলা এনে বললে, কলা খাবে?

রাখালরাজা করুণকণ্ঠে বললে, কী করে কলা খাব? আমার যে হাত-পা বাঁধা রয়েছে!

প্রহরী তখন করুণা আর দয়া দেখিয়ে কলা দুটোকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজে একটা মুখে পুরলে, আর বাকীটা রাখালরাজার মুখে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

আর রাখালরাজা, সেই অসহায় অবস্থায় মনে মনে ভাবলে, সত্যি কী আমি বন্দী! হঠাৎ রাখালরাজার কানে একটা শব্দ এলো···শব্দটা ঠিক একটা বাঘের মতই। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘরে একটা মশাল হাতে কোথা থেকে ছুটে এলো একটা বিকট দৈত্য। হাতে তার বিরাট একটা তবলা।

হাসতে হাসতে তবলাটাতে তাল দিয়ে বললে দৈত্যটা, আমায় চিনবে না ভাই, আমি হচ্ছি নিঝুমপুরীর সেরা গাইয়ে। কাল তোমার বিচার হবে। রাজা মশাইয়ের হুকুমে এসেছি। তোমাকে গান শোনাতে হবে। এ দেশে বন্দীদের প্রহার করার নিয়ম নেই, একটা গানেই তার যথেষ্ট।

এই না বলতে বলতে বিরাট সেই দৈত্যটা তবলা বাজাতে বাজাতে গান ধরলে। সে কি গান!

গান শুনতে শুনতে রাখালরাজার কান প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।

একগাল হেসে সেই বিকট গাইয়েটা বললে, কিগো, গান ভাল লাগছে তো?

ভয়ে ভয়েই রাখালরাজা বললে, এমন গান আমি আগে শুনি নি। এই প্রথম ও শেষ তোমার গান শুনলাম।

তার মানে ? বলতে বলতেই গাইয়ে দৈত্যটা খুব জোরে হাসলো, তারপর হাসতে হাসতে সারা ঘরটা কাঁপিয়ে তুললো। তারপর আরও জোরে হাসতে হাসতে রাখালরাজার গায়ের মধ্যে বিকট সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করলো।

হাত-পা বাঁধা, তার ওপর সুড়সুড়ি, রাখালরাজা একেবারে অসাড় হয়ে গেল।

তারপর গাইয়ে দৈত্যটা চলে গেল।

রাখালরাজা ভাবছে কী করবো ? চোখে ঘুম এসেছে। তারপর সত্যি সত্যি যখন চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো, তখন রাখালরাজা দেখলো কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠলো রাখালরাজা, দেখলো অতীবীর আর মহাবীরকে।

তারা বললে, ওঠ।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রাখালরাজার হাত-পা ছুটোকে তুলে ধরে নিয়ে একেবারে বাইরে চলে এলো।

অতিবীর বললে, তোমার শাস্তি গ্রহণ কর। তুমি কেন পাহাড়ের ওপর উঠেছিলে ? কেন তুমি ঝরণা নদীর ধারে গিয়েছিলে ? কেন তুমি পদ্মফুল ধরতে গিয়েছিলে ? সত্যি করে বল। তোমাকে দেখে মনে হয় না তুমি কোন গুপ্তচর।

রাখালরাজা চুপ করে রইল।

এমন সময় দৈত্যরাজ হিংটং আর লম্বোদর এসে হাজির।

দৈত্যরাজ হিংটং প্রসন্ন হেসে রাখালরাজাকে বললেন, কি নাম তোমার, কোথা থেকে এসেছ ?

রাখালরাজা বললে, আমি রাখাল, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াই। তাই এসেছিলাম।

রাখালরাজার নাম শুনে দৈত্যরাজ খুশী হয়ে বললেন, যাও তোমাকে মুক্তি দিলাম।

দৈত্যরাজ হিংটং-এর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা

বিকট ঘণ্টার আওয়াজ হলো। তারপর যেন সারা দৈত্যপুরীটাতে আনন্দের রোল বেজে উঠলো।

কেন?

আজ দৈত্যরাজের জন্মদিন কিনা তাই

সে কি বাজনা!

হাজার হাজার লোক মশাল হাতে আনন্দে নাচতে লাগলো।

একসঙ্গে হাজার হাজার ঢাক ঢুলি বাজনা বাজাতে লাগলো।

দৈত্যরাজ বললেন, আজ আমার জন্মদিন বলে তোমাকে প্রাণে মারলাম না। আজই তোমাকে মুক্তি দিয়ে দেব। গুপ্ত সংকেত যাতে না জানতে পার তার জন্য ব্যবস্থা করা হবে।

এই বলে দৈত্যরাজ হিংটং সস্নেহে রাখালরাজাকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর বললেন, তোমার মঙ্গল হোক।

তারপর রাখালরাজাকে সঙ্গে নিয়ে হাজার হাজার মশালে সজ্জিত দৈত্যদের সঙ্গে সেনাপতি লম্বোদর এলো। সঙ্গে সঙ্গে বৃকোদর, অতিবীর আর মহাবীর।

রাজপুরী ছেড়ে ফটকের কাছে এসেছে রাখালরাজা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে উঁচুনীচু পাহাড়। দেখা যাচ্ছে সামনে ঝরণা নদীর জল, পদ্মফুলের মেলা।

ঠিক সেই সময়েই সেনাপতি লম্বোদর একটা লাল রং-এর পাথর বার করে রাখালরাজার সামনে ধরলে। আর তখনি রাখালরাজা দেখলে সব অন্ধকার। এমন কি একটা দৈত্যও নয়। শুধু হাজার হাজার বাজনার আওয়াজ।

তারপর একটা অদ্ভুত ধরনের জল রাখালরাজার চোখে ও মুখে ছিটিয়ে দিলে।

আর দেখতে দেখতে রাখালরাজা জ্ঞান হারালো। তার কিছুই মনে থাকলো না। যখন জ্ঞান হলো চেয়ে দেখলে ঠিক আগের জায়গায় সে এসে গেছে।

কেমন করে গিয়েছিল নিঝুমপুরীতে আর কেমন করেই ফিরে এলো তা আর মনে নেই রাখালরাজার!

এমন সময় দেখতে পেল রূপরাজ্যের যাদুকর সিন্ধুবীর ও কয়েকজন সিপাই নিয়ে এদিকে আসছেন।

রাখালরাজা তো দেখে অবাক!

আশ্চর্য! এখানে সিন্ধুবীর এলেন কী করে?

সিন্ধুবীর হাসতে হাসতে বললেন, ভয় নেই রাখালরাজা, তোমার বিপদের কথা শুনেই এসেছি আমি।

রাখালরাজা বললে, আমার খবর পেলেন কি করে?

সিন্ধুবীর বললেন, হঠাৎ রাণী রূপবতীর খেয়াল হলো তোমার বাঁশী শুনবেন। তাই সারা রূপরাজ্যে যখন তোমার খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন আমায় বললেন খোঁজ নিতে। আমি মায়াবী আয়না দিয়ে এই পাহাড়টার উপর তোমাকে দেখেছিলাম। তারপর অনেকক্ষণ যখন তোমার দেখা পেলাম না মায়াবী আয়নায়, ভয়ানক চিন্তা হলো। তাই চলে এলাম। কোথায় ছিলে?

রাখালরাজা বললে, দৈত্যরাজ হিংটং আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার নিঝুমপুরী রাজ্যে—

এই বলে রাখালরাজা তার সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

তাই শুনে যাদুকর বললেন, বটে! কেমন করে গেলে, আর কেমন করে ফিরে এলে সেটা তোমার মনে নেই! চল এবার ফিরে যাওয়া যাক। রানীমা তোমার জন্য ভাবছেন।

যাদুকর সিন্ধুবীর, রাখালরাজা ও সৈন্য-সিপাইদের নিয়ে ফিরে চলেছে রূপরাজ্যে। এমন সময় হঠাৎ আকাশে শোনা গেল একটা সোঁ-সোঁ শব্দ।

কী দেখলেন সিন্ধুবীর?

দেখলাম একটি লাল টুকটুকে টিয়াপাখি ঝড়ের মত উড়ে চলছে।

তাই দেখে রাখাল বললে, আকাশে কি দেখলেন যাদুকর?

যাতুকর হেসে বললে, লাল টুকটুকে টিয়াপাখি।

যাতুকর রাখালরাজাকে রানীমা'র কাছে হাজির করলো। রানীমা হেসে বললেন, আমার রাজ্য ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে রাখালরাজা?

রাখালরাজা হেসে পূর্বের সব ঘটনা বললো। শুনে রানীমা বললেন, এযাত্রা খুব বেঁচে গেছ। ওদিকে আর যেয়ো না। তোমার বাঁশী শোনার জন্য মন বড় ব্যাকুল হয়েছিল। এবার তোমার মনমাতানো সুরে বাঁশী বাজাও, আমি প্রাণভরে শুনি।

রাখালরাজা রানীর নিকটে রক্ষিত আসনে বসলো। তারপর তার বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলো। সে কী সুর—তাল—লয়—

বাঁশী শুনে রানীমা'র মন আনন্দে ভরে গেল। সে বাঁশীর সুর শুনতে পেলে তোমাদের মনও হয়তো আনন্দে নেচে উঠতো।
